সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ২৯-৩০
- বার : সোমবার

- ১৭ এপ্রিল- ২০২৩ ঈসায়ী
- ০৪ বৈশাখ- ১৪৩০ বাংলা
- ১৭ রামাযান- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **ক্বদ্‌র রাতের মর্যাদা**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - **মাহে শাওয়াল : গুরুত্ব ও করণীয়**
    অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক- ০৮
  - **সুলতানি আমলে বাংলায় উৎসব : ঈদুল ফিত্‌র প্রসঙ্গ**
    আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১০
  - **যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন : কিছু প্রস্তাব**
    লেখক : প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১৩
  - **সুন্নাহর আলোকে ফিতরা আদায়ের সঠিক সময়**
    আবু লাবীবা মুহাম্মাদ মাকসুদ- ১৫
  - **মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**
    তানযীল আহমাদ- ১৭
  - **পাপের শাস্তি অনিবার্য**
    মো. আবু তালেব হীরা বিন মুনসুর আলী- ২২
  - **বিপদের বন্ধু তৈরি করুন**
    মো. খাশিউর রহমান বিন মুনসুর আলী- ২৩
- **সাহাবা-চরিত :**
  - **আবূ যার্ গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন কথা**
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী- ২৫
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - **সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর বিচক্ষণতা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৯
- **বিশেষ মাসায়িল** ৩০
- **সমাজচিন্তা :**
  - **পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসব এবং সমাজ চিত্র**
    কে এম আব্দুল জলিল- ৩২
- **কিশোর ভুবন :**
  - **হাতিব ইবনু আবী বালতায়া : এক বদরী সাহাবীর ঘটনা**
    আবু তাসনীম- ৩৫
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৭
- **শুব্বান সংবাদ** ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৫

সম্পাদকীয়

‘ইবাদতে ধারাবাহিকতা কল্যাণ প্রত্যাশির পরিচয়

(এক) নফল সিয়াম

চিরাচরিত নিয়মে এবারও রামাযান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে। রেখে যাবে হাজারো স্মৃতি। সালাফগণ রামাযান আসলে ‘ইবাদতে মশগুল হতেন। আর রামাযান চলে যাওয়ার পর দয়াময় আল্লাহর কাছে তা মঞ্জুরির জন্য কাকুতি-মিনতি করতেন। সফলকাম সেই, যে রামাযান পেয়েছে, সিয়াম পালন করছে, রাত্রিতে ক্বিয়াম বা তারাবীহ পড়েছে এবং ক্বদরের রাত পেয়ে ধন্য হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ সৌভাগ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন –আমীন।

রামাযানের সওম পুরো একমাস আমাদেরকে একটি কল্যাণময় রুটিন মুতাবিক পরিচালনা করেছে। আমরা যথাসাধ্য সে রুটিন মেনে চলতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। এ ধারাবাহিকতা সারা বছর মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। সিয়াম মহান আল্লাহর প্রিয় ‘ইবাদত। যার পারিতোষিক তিনি নিজেই দান করবেন। বছরে একমাস সিয়াম পালন করা ফর্‌য। কিন্তু এ প্রিয় ‘ইবাদতের ধারাবাহিকতা সারা বছর ধরে রক্ষা করা অধিক সাওয়াব প্রত্যাশীর পরম কর্তব্য। এ অতিরিক্ত সিয়ামকে নফল সিয়াম বলা হয়। বান্দা যখন একমাস সিয়াম পালন করে, তখন সেটিকে আল্লাহ তা‘আলা ১০ (দশ) গুণ বাড়িয়ে দশ মাসের সাওয়াবে পরিণত করে দেন। আর বছর পূর্তির দু’মাস অবশিষ্ট থাকে। তাই দয়াময় আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে পুরো এক বছরের সাওয়াব দান করার জন্য তার প্রিয় নবী (ﷺ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেন– যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম পূর্ণ করে শাওয়াল মাসে আরো ৬ (ছয়)টি নফল সিয়াম পালন করবে, তাও দশ গুণ বৃদ্ধি করবেন; ফলে (৬ × ১০ = ৬০দিন) দু’মাস যুক্ত করে ১২ মাস তথা পূর্ণ এক বছরের সিয়াম পালনের সাওয়াব দান করবেন।

এ নফল সিয়াম পালনের সুযোগ দিয়ে বান্দাকে তার প্রিয় ‘ইবাদত সিয়াম নিয়মিত পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রতি মাসে ৩টি সিয়াম পালন করলে ১মাস সিয়াম পালনের সাওয়াব পাওয়া যাবে, যা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখতে হয়। আর যারা সাপ্তাহিক সিয়ামে অভ্যস্ত হবে, তাদের ‘আমলসমূহ মহান আল্লাহর দরবারে এমতাবস্থায় পেশ করা হবে যে, তারা সিয়ামরত অবস্থায় আছে। এটি খুবই কল্যাণকর ‘ইবাদত। আর তা সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রাখতে হয়। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার খালেস নিয়তে একটি সিয়াম পালন করলে মহান আল্লাহ বিনিময়স্বরূপ জাহান্নামকে ঐ লোকের নিকট হতে সত্তর বছরের পথের দূরত্বে সরিয়ে দেন। এতো সুযোগ পাওয়ার পরও যারা সিয়ামের ন্যায় কল্যাণকর ‘ইবাদত ধারাবাহিকভাবে পালন করতে অলসতা করে, তারা সত্যিই হতভাগা। তাই আসুন! আমরা রামাযানের পরও বছর জুড়ে কল্যাণময় ‘ইবাদত সিয়াম পালন করার অভ্যাস জারি রাখি এবং বিনিময়ে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে পরিগণিত হই।

(দুই) ঈদ বার্তা

ঈদ মহান আল্লাহর ক্ষমার সুমহান বার্তা নিয়ে প্রতি বছর আমাদের মাঝে ঘুরে আসে। মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা এ আনন্দ ও কল্যাণময় ঈদ বছরে ২টি দান করেছেন। একটি হলো ঈদুল ফিত্‌র এবং অপরটি হলো ঈদুল আযহা। ইয়াহুদিরা নিছক উৎসব পালন করত। তাতে অহেতুক সময় নষ্ট ও সামান্য বিনোদন ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তার প্রিয় বান্দা মুসলিমগণকে আনন্দের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করার নিমিত্তে বছরে দু’টি দিন দান করলেন, যাতে উৎসবের পাশাপাশি পুণ্যময় ‘ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। তারা ঈদের দিন মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে। তার কাছ থেকে মাগফিরাত লাভ করবে এবং সাথে সাথে আনন্দ-উৎসব পালন করবে। সে জন্য বলা হয়, মুসলিমগণের ঈদ নিছক উৎসব সর্বস্ব নয়; বরং ‘ইবাদত পালনের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত উৎসব পালন। প্রকৃত সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যে ঈদের খুশিকে ষোলকলায় পূর্ণ করতে মহান আল্লাহর তরফ থেকে জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভের ঘোষণা পাবে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ ঈদকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও অশ্লীলতামুক্ত রাখা এবং পবিত্র ঈদের গাম্ভীর্যতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা।

মহিলা ও শিশুদেরকে ঈদ-আনন্দে শরিক করতে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের জন্য ফর্‌য সালাত ঘরে পড়া উত্তম বললেও ঈদগাহে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কারো কাছে পর্দা করার মতো উড়না না থাকলে অপর মুসলিম বোনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে হলেও সে যেন ঈদগাহে যায়, তা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজ পুরো উল্টা। তারা মহিলাদেরকে ঈদের আনন্দ ও সাওয়াব লাভ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে- যা তাদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার বৈ আর কী? আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সত্য উপলব্ধি করার ও তা বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দান করুন এবং যাবতীয় অকল্যাণ হতে হিফাযত করুন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

ক্বদ্‌র রাতের মর্যাদা

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার অভ্যুদয় পর্যন্ত।"[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা লায়লাতুল ক্বদ্‌রে কুরআন অবতীর্ণ করেন। এই রত্রিকে লায়লাতুল মুবারকও বলা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

"নিশ্চয় আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে।"[২]

কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত যে এ রাত্রি রামাযানুল মুবারকময় মাসে রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রামাযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[৩]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌রে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুয হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূল (ﷺ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা লায়লাতুল ক্বদ্‌রের শান শওকত ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন : এই রাত্রির এক বিরাট বরকত হলো এই যে, এ রাতে কুরআন মাজিদের মতো মহান নিয়ামত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "হে নবী (ﷺ)! লায়লাতুল ক্বদ্‌র যে কি তা কি জানা আছে? লায়লাতুল ক্বদ্‌র হাজার মাসের চায়েও উত্তম।"

মুসনাদে ইবনু আবী হাতিমে মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (ﷺ) বানী ইসরা-ঈলের এক ব্যাক্তির উল্লেখ করে বলেন : ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত মহান আল্লাহর পথে অস্ত্র ধারণ করেছিল অর্থাৎ- জিহাদে অংশ নিয়েছিল। মুসলমানরা এ কথা শুনে বিস্মিত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌রের 'ইবাদাত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের 'ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।

* মুসনাদে আহমাদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রামাযান মাস এসে গেলে রাসূল (ﷺ) বলতেন– তোমাদের উপর রামাযান মাস এসে পড়েছে। এ মাস খুবই বরকত পূর্ণ বা কল্যাণময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ মাসের রোযা ফর্‌য করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে বঞ্চিত হয় সে প্রকৃতই হতভাগ্য। আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে ক্বদ্‌রের রাত্রিতে 'ইবাদাত করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৪]

* আবূ 'আসিম নুবায়েল (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সনদে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) একবার বলেছিলেন : আমাকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রামাযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এটা রয়েছে। এ রাত্রি খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এ রাতে শীতও বেশি থাকে না এবং গরমও বেশি থাকে না। এ রাত্রি এতো বেশি উজ্জ্বল থাকে যে, মনে

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[১] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ১-৫।*

[২] *সূরা আদ্ দুখা-ন : ৩।*

[৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

[৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

হয় যেন চাঁদ হাসছে। রৌদ্রের তাপ ছড়িয়ে পড়ার আগে সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।

* মুরসিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে আপনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কি প্রশ্ন করেছিলেন? আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন : জেনে রাখো যে, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞেস করতাম। একবার বললাম : হে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আচ্ছা লাইলাতুর ক্বদ্‌র কি রামাযান মাসেই রয়েছে? না অন্য মাসে রয়েছে? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন : লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযান মাসেই রয়েছে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : এ রাত্রি কি নবীদের জীবদ্দশা পর্যন্তই থাকে, না কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে? রাসূল উত্তরে বললেন, কিয়ামত পযর্ন্তই অবশিষ্ট থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ রাত্রি রামাযানের কোন অংশে রয়েছে? তিনি জবাবে বললেন : এ রাত্রি রামাযানের প্রথম দশকে ও শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। আমি তখন নিরব হয়ে গেলাম। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য দিকে মনোনিবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার উপর আমার যে হক্ব রয়েছে এ কারণে আপনাকে কসম দিচ্ছি, দয়া করে আমাকে সংবাদ দিন, ক্বদ্‌রের নির্দিষ্ট রাত্রি কোন্‌টি? তিনি এ কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন, তাকে আমার উপর এ রকম রাগতে আর কোনোদিন দেখেনি। অতঃপর তিনি বললেন : শেষ দশ রাত্রে তালাশ করো। আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বদ্‌রের রাত্রি পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও ছিল। এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর ও কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছর আসতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন ক্বদ্‌রের রাত্রে, আর সেই রাত্রিটি হলো বরকতময় রাত্রি। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

"আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রে।"[৫]

আর সেই রাত্রিটি হলো ক্বদ্‌রের রাত্রি, রামাযান মাসে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্যরা বলেন– এই কুরআনকে একসাথে লাওহে মাহফুজ থেকে বায়তুল ইয্‌যাতে নাযিল করা হয়েছে, বাইতুল ইজ্জাত থেকে দুনিয়ার আসমানে, তারপর বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তেইশ বছরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

ক্বদ্‌রের রাত কখন?

* আবূ আসিম নুবায়েল (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সনদে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার বলেছিলেন : আমাকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রামাযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এটা রয়েছে। এ রাত্রি খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এ রাত্রে শীতও বেশি থাকে না এবং গরম বেশি থাকে না। এ রাত্রি এতো বেশি উজ্জ্বল থাকে যে, মনে হয় যেন চাঁদ হাসছে। রৌদ্রের তাপ ছড়িয়ে পড়ার আগে সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।

* মুরসিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবূ যারকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলাম লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে আপনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কি প্রশ্ন করেছিলেন? আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন : জেনে রাখো যে, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞেস করতাম। একবার বললাম : হে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আচ্ছা লাইলাতুর ক্বদ্‌র কি রামাযান মাসেই রয়েছে? না অন্য মাসে রয়েছে? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন : লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযান মাসেই রয়েছে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : এ রাত্রি কি নবীদের জীবদ্দাশা পর্যন্তই থাকে, না কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে? রাসূল উত্তরে বললেন, কিয়ামত পর্যন্তই অবশিষ্ট থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ রাত্রি রামাযানের কোন অংশে রয়েছে? তিনি জবাবে বললেন : এ রাত্রি রামাযানের প্রথম দশকে ও শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। আমি তখন নিরব হয়ে গেলাম। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যদিকে মনোনিবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উপর আমার যে হক্ব রয়েছে এ কারণে আপনাকে কসম দিচ্ছি, দয়া করে আমাকে সংবাদ দিন, ক্বদ্‌রের নির্দিষ্ট রাত্রি কোন্‌টি? তিনি এ কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন, তাকে আমার উপর এ রকম রাগতে আর কোনোদিন দেখেনি। অতঃপর তিনি বললেন : শেষ দশ রাত্রে তালাশ করো। আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

ক্বদ্‌রের রাত্রির আলামাত :

* আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : লায়লাতুল ক্বদ্‌র পরিষ্কার, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ এবং শীত গরম হতে মুক্ত রাত্রি। এ রাত্রি শেষে সূর্য স্নিগ্ধ আলোকআভায় রক্তিম বর্ণে উদিত হয়।

[৫] *সূরা আদ্‌ দুখা-ন : ৩।*

আবূ ‘আসিম নুবায়েল (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সনদে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার বলেছিলেন : আমাকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রামাযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এটা রয়েছে। এ রাত্রি খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এ রাত্রে শীতও বেশি থাকে না এবং গরম বেশি থাকে না। এ রাত্রি এতো বেশি উজ্জল থাকে যে, মনে হয় যেন চাঁদ হাসছে। রৌদ্রের তাপ ছড়িয়ে পড়ার আগে সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।

ক্বদ্‌রের রাত্রির ‘ইবাদতের গুরুত্ব :

* মুসনাদে আহমাদে ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, যখন রামাযান মাসের দশ দিন বাকী থাকত তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তহবন্দ বেঁধে নিতেন এবং স্ত্রীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতেন।

* ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, রামাযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে সমান গুরুত্বের সাথি তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাত্রের উপর প্রধান্য দেয়া যাবে না।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই তো দু‘আর আধিক্য মুস্তাহাব, তবে রামাযান মাসে দু‘আ আরো বেশি করে করতে হবে, বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাত্রে। নিম্নের দু‘আটি খুব বেশি পাঠ করতে হবে।

"اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ".

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন![৬]

* মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যদি আমি ক্বদ্‌রের রাত পেয়ে যায় তবে আমি কি দু‘আ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন : "اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ". এই দু‘আটি পাঠ করবে।

* পরিশেষে বলা যায় যে, ক্বদ্‌রের রাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সকলকে যেন ক্বদ্‌রের রাত্রে ‘ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করেন –আমিন। ❑

[৬] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫১৩; ইবনু মাজাহ্- ৩৮৫০, সহীহ।*

যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন : কিছু প্রস্তাব

[১৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রস্তাবিত ১১টি অনুষদ হলো– **১.** কুল্লিয়াতুল কুরআন বা আল-কুরআন অনুষদ। **২.** কুল্লিয়াতু উলূমিল কুরআন বা কুরআনিক সাইন্স অনুষদ। **৩.** কুল্লিয়াতু উলূম ফিল কুরআন বা সাইন্স ইন দ্যা হলি কুরআন অনুষদ। **৪.** কুল্লিয়াতু বালাগাতিল কুরআন বা আল-কুরআনে অলংকারশাস্ত্র অনুষদ। **৫.** কুল্লিয়াতু ফালসাফাতিল কুরআন বা কুরআনিক দর্শন অনুষদ। **৬.** কুল্লিয়াতুত তাফসীর বা তাফসীর অনুষদ। **৭.** কুল্লিয়াতু কিরাআতিল কুরআন বা মেথডোলজি অব কুরআন রিসাইটিং অনুষদ। **৮.** কুল্লিয়াতুল হাদীস বা আল-হাদীস অনুষদ। **৯.** কুল্লিয়াতুল অসুলিল হাদীস বা আল-হাদীসের মূলনীতি অনুষদ। **১০.** কুল্লিয়াতুত দাওয়াহ বা আদ দাওয়াহ অনুষদ। **১১.** কুল্লিয়াতু মুকারানাতিল আদইয়ান বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানবিষয়ক তিন থেকে ৫টি অনুষদ রয়েছে। এরপরেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষায়িত এক্সপার্ট তৈরির জন্য প্রায় ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অথচ দেশের ৯০% মুসলিম রাষ্ট্রে একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তাতেও আবার জন্ম থেকে অদ্যাবধি ৩টি বিভাগ– বিষয়টি এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য সত্যিই পরিতাপের বিষয়। তাই অনতি বিলম্বে এসব অনুষদ খুলে এগুলোর অধীনে ৫/৬টি করে বিভাগ খোলা যেতে পারে।

অথবা এসব অনুষদ নিয়ে ঢাকায় আরেকটি পরিপূর্ণ আবাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তাহলে সিলেবাস পড়ে দেশের বিজ্ঞানী প্রকৌশলী ডাক্তার সকলেই কুরআন হাদীস এবং ধর্মীয় রীতি নীতির কথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন এবং সে অনুযায়ী দেশ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

বর্তমানে দেশের সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব এর মূল কারণ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা না পাওয়া। তাই সিলেবাস প্রণয়নে ধর্মীয় বিষয়কে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং সিলেবাস প্রণয়নকারী ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কে নিয়োগ দিতে হবে তা না হলে বর্তমান দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যত বড় ধস নেমেছে এ ধরনের ধস নামতেই থাকবে। তবে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, দেশের সর্বক্ষেত্রে যেটা কেউ ঠেকাতে পারবে না। ❑

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

⊡ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رضي الله عنه)، قَالَ : سَمِعتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، يَقُوْلُ : «اقْرَؤُوْا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ».

⊡ আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৮০৪)*

⊡ وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ (رضي الله عنه)، قَالَ : سَمِعتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

⊡ নাওয়াস ইবনু সামআন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "কুরআন ও ইহজগতে তার উপর 'আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা আল বাক্বারাহ্ ও সূরা আ-লি 'ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৮০৫)*

⊡ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

⊡ 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫০২৭, ৫০২৮)*

⊡ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «اَلَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ».

⊡ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধ ভাবে পাঠকারী ও পানির মতো হিফযকারী পাকা) হাফেয মহা সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফেরেশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব" (একটি তিলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৯৮)*

⊡ وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ (رضي الله عنه) : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ».

⊡ 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) দ্বারা (তার উপর 'আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৮১৭)*

⊡ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)، قَالَ : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

⊡ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) দিবা-রাত্রি পড়ে ও 'আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে (মহান আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫০২৫, ৭৫২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৮১৫)*

প্রবন্ধ

মাহে শাওয়াল : গুরুত্ব ও করণীয়

–অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক*

বর্তমান যে সময়ে আমরা উপনীত বা যে মুহূর্তটা আমরা অতিক্রম করছি তা রামাযান মাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এর পরের মাস শাওয়াল। শাওয়াল আরবি/হিজরী/কামারী তথা চান্দ্র সনের ১০ম মাস। মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের ১৫০ বছর পূর্বে ৪১২ খ্রিষ্টাব্দে নবী (ﷺ)-এর ঊর্ধ্বতন ৫ম দাদা কিলাব বিন মুররাহ এর সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে আরবের বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও সরদারগণ হজ্জ মৌসুমে সমবেত হয়ে মাসসমূহের নতুনভাবে একক নামকরণ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা স্বীকৃতি লাভ করে ও সকলের নিকট গৃহীত হয়। কেননা তার পূর্বে এই মাসগুলোর প্রত্যেক গোত্রের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। নামকরণের সময় তৎকালীন পরিবেশ ও অবস্থা বিবেচনায় রাখা হয়।

১. প্রথম মাসকে তাঁরা মুহার্‌রাম তথা মুহররামুল হারাম রাখেন, যার অর্থ নিষিদ্ধ ও পবিত্র। কেননা তারা তথা জাহেলী যুগের লোকেরা উক্ত মাসে সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াই-ফাসাদকে নিষিদ্ধ মনে করতেন। জাহেলীগণের মাঝেও যে কিছু ইসলামী রীতিনীতি বা ইবরাহীমী সুন্নাত কিছুটা অবশিষ্ট ছিল এটা সেগুলোর অন্যতম।

২. সফর মাস, সফর শব্দের অর্থ খালি, শূন্য, ফাঁকা। কেননা আবরদের বাড়ীঘর মুহাররম মাসের শেষে সফর মাসে যুদ্ধের কারণে খালি হয়ে যেত। অর্থাৎ- লড়াই ও যুদ্ধের জন্য সকলে বের হয়ে পড়লে তাদের ঘরবাড়ীগুলো খালি হয়ে পড়তো। ফলে উক্ত মাসকে সফর মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অথবা বলা হয় যে, উক্ত মাসে যুদ্ধ করে তারা নিঃস্ব তথা সম্বলহীন ও খালিহাত হয়ে যেত, ফলে উক্ত মাসকে সফর মাস বলা হয়।

৩. রবিউল আওয়াল, অর্থাৎ- প্রথম বসন্ত। কেননা সফরের পরবর্তী সময়টা তৎকালীন সময়ে ঋতুরাজ বসন্তকাল ছিল।

৪. রাবীউস্ সানী, অর্থাৎ- দ্বিতীয় বসন্ত। কেননা উক্ত বসন্তের সময়টা পরবর্তী মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। ফলে এটাকে রাবীউস্ সানী তথা দ্বিতীয় বসন্ত মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৫. জুমাদিউল উলা মাস, জুমাদা অর্থাৎ- জমাট বাঁধা বা জমে যাওয়া। উক্ত মাসটা তৎকালীন সময়ে তীব্রতর শীতকালীন হওয়ায় পানি পর্যন্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, ফলে জুমাদিউল উলা অর্থাৎ- প্রথম জমাট বাঁধার মাস হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৬. জুমাদিউল আখিরাহ অর্থাৎ- পরবর্তী বা দ্বিতীয় জমাট বাঁধার মাস। কেননা উক্ত তীব্রতর শীত পরবর্তী মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

৭. রজব মাস। রজব অর্থ কোনো কিছুকে মহান মনে করা ও তাকে সমীহ করা। রজব হারাম তথা পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসসমূহের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে জাহেলীগণও এই মাসকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন ও এটি একটি মহান মাস মনে করতেন, ফলে তাকে রজব মাস হিসেবে বলা হয়। রজব তারজীব হতে হলে তার আরো একটি অর্থ হলো খুলে ফেলা। আরবরা যেহেতু উক্ত পবিত্র মাসে তীরকে ধনুক হতে খুলে রাখতো, সেহেতু উক্ত মাসকে রজব তথা খুলে ফেলার মাস হিসেবে নামকরণ করা হয়।

৮. শা'বান মাস। শা'বান অর্থ বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া। কেননা তারা উক্ত মাসে রিযিক অন্বেষণে বা রজব মাসে গৃহে বসে থাকার কারণে শা'বান মাসে যুদ্ধের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে পড়তো, ফলে উক্ত মাসকে শা'বান মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৯. রামাযান মাস। রামাযান রাম্য ধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ সূর্যের তীব্র তাপদাহ বা অত্যধিক গরম বা উষ্ণ। তৎকালীন সময়ে উক্ত মাসে অসহনীয় গরম পড়ার কারণে উক্ত মাসকে রামাযান মাস অর্থাৎ- অত্যাধিক গরমের মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১০. শাওয়াল মাস। শাওল হতে নির্গত শাওয়াল। থানের অবশিষ্ট দুধ অথবা পাত্রের অবশিষ্ট পানিকে শাওল বলা হতো। উটের দুধ কমে যাওয়া তথা হ্রাস পাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়াকে শাওলান বা শাওয়াল বলা হতো। শাওয়াল অর্থ অত্যাধিক মাত্রায় দুধ শুকিয়ে যাওয়া বা পানি শুকিয়ে যাওয়া। শাওয়ালের আর এক অর্থ উপরে উঠা, সেটাও মূলত জাহেলীগণ পূর্বের অর্থেই নিত। অর্থাৎ- উটের দুধ শুকিয়ে গেলে অথবা উট গর্ভবতী হলে তার দুধের থান উপরে উঠে যেত অর্থাৎ- দুধ শুকিয়ে যেত। নামকরণের সময় উক্ত মাসে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে উক্ত মাসের নামকরণ করা হয় শাওয়াল নামে। মূলত সে কারণেই জাহেলীগণের কুসংস্কার ছিল যে, তারা উক্ত শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী করতো না। তারা মনে করতো তাদের বিবাহ-শাদী বরকতহীন হয়ে যাবে। তাছাড়া কথিত আছে যে, তখন দেখা গেছে, সে সময় মাদী উট ষাঁড় উটকে তার সাথে মিলন

* *মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

করতে দিত না। সুতরাং তারা মনে করতো যে, উটের ন্যায় তারাও এ মাসে নব দম্পতি হিসেবে মিলন করবে না। অর্থাৎ- তারা এ মাসে বিয়ে-শাদী করবে না।

১১. যুলকা'দাহ বা যিলকা'দাহ অর্থাৎ- বসে থাকার মাস। যুলকা'দাহ হারাম মাসসমূহের অন্যতম হওয়ায় জাহেলীগণ উক্ত মাসে নিজ গৃহে বসেই থাকতো। খুব একটা বের হতো না, বা যুদ্ধের জন্য একেবারেই বের হতো না, ফলে উক্ত মাসকে যুলকাদাহ তথা বসে থাকার মাস হিসেবে নামকরণ করা হয়।

১২. যুল হিজ্জাহ অর্থাৎ- হজ্জের মাস। কেননা জাহেলী আরবগণ ও উক্ত মাসে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হতো ও উক্ত মাসকে হজ্জের মৌসুম হিসবে গণনা করতো। স্মর্তব্য যে, উক্ত পবিত্র যিলহজ্জ মাসও চারটি হারাম মাসের অন্যতম।

শাওয়াল মাসের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শাওয়াল মাস পবিত্র হজ্জের মাসসমূহের অন্যতম; বরং তা হজ্জের মাসসমূহের সূচনা ও প্রারম্ভিক মাস।

২. নবী (ﷺ) শাওয়ালের ৬টি রোযার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রামাযানের সাওম পালন করলো অতঃপর শাওয়ালের ৬টি সওম তথা রোযা রাখলো সে যেন সারা বছরের সওম পালন করলো।[৭] অর্থাৎ- ৬টি রোযা ৬ × ১০ = ৬০ দিন তথা দুই মাসের রোযার সমতুল্য।

৩. উক্ত মাসের প্রথম দিনই হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। যে দিনটি মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র ও মহা উৎসবের। যাকে অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাস ও পূর্ণ ভাব-গাম্ভির্যপূর্ণভাবে বিশ্বময় উদযাপন করা হয় ও জামা'আত সহকারে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করা হয়।

৪. পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনই বা তার ২/১ দিন পূর্বে ঈদের সালাতের পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা হয়, যা ফকীর-মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ ও সওম পালনকারীগণের জন্য তার সওমকে পবিত্রতাকারী স্বরূপ বিবেচ্য।

৫. ১ম হিজরির শাওয়াল মাসে নবী (ﷺ) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন।

৬. ইসলামের ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী উহুদ যুদ্ধ ৩য় হিজরীর ৭ম তারিখ শনিবার সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (ﷺ)-এর প্রিয় চাচা সাইয়িদুশ শুহাদা হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৭. খন্দক তথা পরিখার যুদ্ধ, যার অপর নাম আহযাব তথা বহুজাতিক বাহিনীর যুদ্ধ, সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছিলেন। আর বহুজাতিক বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল।

৮. ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে বিশ্ব নবীর নেতৃত্বে পবিত্র হুনাইন যুদ্ধ (ফাতহে মক্কার পর) এবং সে যুদ্ধে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেছিলেন।

৯. হিজরতের ১ম বছরের শাওয়াল মাসে হিজরতের পর মুহাজিরীনদের ১ম সন্তান হিসেবে 'আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জন্মগ্রহণ করেন।

১০. ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বানু কাইনুকার সাথে যুদ্ধ হয়।

১১. হামরাউল আসাদ নামক যুদ্ধ শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধের একদিন পরেই শুরু হয় এবং তিনদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়।

১২. হুনাইন যুদ্ধের পরেই শাওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ হয়।

১৩. আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) ১৯৪ হি. ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর রাতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের রাতে 'ইশার সালাতের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৪. ১১০ হিজরীর শাওয়াল মাসে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) ইন্তিকাল করেন।

১৫. 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৪৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

১৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) ৬০৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

বিবাহের সর্বোত্তম সময় শাওয়াল

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (ﷺ) আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন এবং তিনি আমার সাথে বাসরও করেন শাওয়াল মাসে। নবী (ﷺ)-এর কোন স্ত্রী তার নিকট আমার চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল? ইমাম নাবাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জাহেলী যুগের প্রথার বিরোধিতা করেন যে, তারা যে ধারণা পোষণ করতো, শাওয়াল মাসে বিবাহ শুভ হয় না, তা একেবারেই ভ্রান্ত।

অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে, বিবাহ শাদীর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে শাওয়াল মাস।

শাওয়াল মাসে আমাদের করণীয়

রামাযান পরবর্তী শাওয়াল তথা অন্যান্য মাসগুলোতে পবিত্র মাহে রামাযানে অর্জিত তাক্বওয়া ও নৈতিকতার আলোকে আলোকিত হয়ে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে এবং আমাদের সন্তানদের তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। নইলে তারা বখে যাবে ও ঐশীদের মতো কুলাঙ্গাররা আমাদের সমাজ ও জীবনকে কলুষিত করে ফেলবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার তাওফীক্ব এনায়েত করুন –আমীন। ❑

[৭] *সহীহ মুসলিম।*

সুলতানি আমলে বাংলায় উৎসব : ঈদুল ফিত্‌র প্রসঙ্গ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতানি আমলে বাংলার ইতিহাস একটি চমকপ্রদ অধ্যায়। বাংলার পরিবেশ-প্রকৃতি বাংলার ইতিহাস বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। দিল্লী থেকে সরাসরি নদীমাতৃক বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা-পরিচালনা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। গজনীও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বত সঙ্কুল স্থানে ঘুর রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই ঘুর বংশের (১১৭৫-১২০৬) অন্যতম স্থপতি মুঈজউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবক ভারত জয় করেন। তারই সুযোগ্য, তেজস্বী ও তরুণ সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। মাত্র ১৮জন সশস্ত্র অগ্রগামী সৈন্য নিয়ে বিহার ও বাংলা জয়ের সূচনা করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে সেন বংশের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বখতিয়ার খলজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সমসাময়িক সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও প্রায় নিশ্চিত বলা যায় যে, তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বে তিস্তা-করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৮]

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর (১২০৬) ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বংশ পরম্পরায় দিল্লীর শাসনাধীনে থেকেছে। বাহরাম খানের (১৩২৮-১৩৩৮) মৃত্যুর পর বর্মরক্ষক ফখরউদ্দিন বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্বক সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসন অধিকার করেন।[৯]

এ সময় হতেই স্বাধীন সালতানাতের আমল শুরু হয়। অন্ততঃ দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) প্রধান দু'টি বংশ দ্বারা শাসিত বাংলা দিল্লীর নাগপাশ থেকে মুক্ত থেকেছে। বাংলা কেন্দ্রিক পল্লবিত হয়েছে সমাজ-সংস্কৃতি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস করেছে। বিকশিত হয়েছে বিদ্যমান সকল ধর্ম ও ভাষার নানান ক্ষেত্র। বিশেষতঃ নিজ নিজ ধর্ম পালনে অবারিত স্বাধীনতা মানুষের মাঝে গড়ে উঠেছে অনিঃশেষ আস্থা ও ভক্তি।

সুলতানি আমলে মুসলমানরা পালন করেছে তাদের ঈদ উৎসব। ঈদ মানেই তো খুশি। ঈদ মানে আনন্দ। যুগে যুগে ঈদ নিয়ে এসেছে মুসলিমদের মাঝে খুশির জোয়ার। সুলতানি আমলে তার সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটেনি; বরং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় ঈদ প্রতিপালিত হয়েছে রাজকীয় ভাবধারায়। বছরে দু'বার ঈদ উৎসব প্রতিপালিত হত। একটি রামাযান মাসের শেষে এবং অন্যটি ১০ জিলহাজ্জ তারিখে। চান্দ্র গণনানুসারে রামাযান নবম মাস। মুসলমানরা এ মাসে রোযা রাখে। রোযার শেষে পালিত হয় ঈদ-উল-ফিত্‌র।

সুলতানি আমলে বাংলার মুসলমানদের মাঝে ধর্মানুরুক্তি প্রবল ছিল। ধর্মীয় বিধিবিধান অনুপুঙ্খভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে আগ্রহের প্রতিফলন দেখতে পাই। রামাযান মাস আগমনের বার্তা মুসলিম সমাজে আলোড়ন পড়ে যেত। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই রোযা প্রতিপালনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতো। পবিত্র রামাযান মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পুষ্প ডালি জনসাধারণ্যে উন্মীলিত হতো। ব্যাকুল হয়ে উঠতো মহান প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য। পাপে তাপে জর্জরিত মানবকুলের প্রতিটি প্রাণ অধিকতর শুদ্ধ পরিশুদ্ধ হয়ে আপন আত্মাকে কলুষমুক্ত করার জোরদার প্রচেষ্টার ঘাটতি থাকতো না। কেননা উভয় জগতের অধীশ্বর পরম করুণাময় চান যে, রামাযানের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকুলের বসবাসের উপযোগী শান্তিপূর্ণ মনোরম স্বর্গীয় গুলবাগিচায় পরিণত হোক। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণু প্রভুর নিকট হতে এসে রহমতে বারীর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হোক। সৃষ্টির সেরা মানুষ তার জৈবিক আগ্রাসী রিপু শক্তিকে দলিত মথিত করে আত্মিক শক্তিকে সমুন্নত করতে আগুয়ান হোক। বিশ্ব চরাচরের কুহেলিকা ভেদ করে সত্যাসত্যের

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৮] Jadunath Sarkar (ed.) *History of Bangal, Vol. 11,* Dacca 1948, P. 12-13।

[৯] ড. মো. ওসমান গনী, *সুলতানি বাংলার প্রাত্যহিক জীবন,* (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসম্পর্ক) রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃ. ৩১।

কাফেলার অনুকরণে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা অবারিত হোক এমনিতবে নানা প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার যোগ। অন্যান্যদের মতো বাঙালি মুসলমানদের মাঝে উদ্বেলন সৃষ্টির নানা সূত্র আমরা দেখতে পাই।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ[১০] অবলম্বনে জানা যায় যে, সুলতান শাসকগণ রামাযান মাসে দৈনন্দিন ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতেন।[১১] আলোচনায় রামাযান মাসের মর্যাদা সুরক্ষার ব্যাপারে সকলেই আন্তরিক ও সতর্ক থাকতেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা নিজেই রামাযানের মর্যাদা রক্ষার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ করেছেন। একটি বিশুদ্ধ হাদীসসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে,

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের নিকট অতি মুবারক মাস রামাযান আগমন করছে, যার রোযাগুলো আল্লাহ তোমাদের উপর ফর্য করে দিয়েছেন। এই মাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য আকাশসমূহের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আর এই মাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য নরকের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানগুলোকে লৌহ শিকল দিয়ে কঠিনভাবে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য একটি বিশেষ রাত্রি নির্ধারিত হয়েছে, যার বন্দেগী এক হাজার রাত্রির (৮৩ বছর ৪ মাস) বন্দেগী হতেও অনেক বেশি। যে হতভাগ্য ব্যক্তি সে রাত্রির বন্দেগী হতে বঞ্চিত, সে হতভাগ্য মাহরূম সে চির বঞ্চিত। আলোচনাক্রমে অবধারিত বিষয়াদির মাঝে সাওয়াব অর্জনের সীমাতিরিক্ত আশ্বাস ও অভয়বানী বাঙালি মুসলমানদের পরম আগ্রহের সৃষ্টি করতো। মহান আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

আদম সন্তানের প্রতিটি সৎ কাজের বিনিময়ে মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে এক থেকে দশ, আর দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব বর্ধিত করেন। তারপর আল্লাহ পাক বলেন যে, 'আল্লাহু ইউজায়েফু লিমাই ইশাউ অল্লাহু ওয়াসেউন আলীম'। একটা সৎ কাজের বিনিময়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব বর্ধিত করার পর মহান আল্লাহর বান্দাদের ইখলাস সততা, আত্মার স্বচ্ছতা অবলোকন করে তিনি যে কোনো সৎ কাজের বিনিময়ে বান্দাকে অফুরন্ত সওয়াব প্রদান করবেন।

আলোচনায় অবধারিত বিষয়াদির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা : তিনি নিজ অনুগ্রহে নফল 'ইবাদতকে ফর্য আর ফর্যকে ৭০টি ফর্যের মর্যাদা দান করে, মানবকুলকে ধন্য করেছেন। পরম ভক্তিরতে বাঙালি সমাজ রোযা প্রতিপালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করেনি।

বস্তুত ইসলামে রোযা পালন একটি অপরিহার্য 'ইবাদত।[১২] সে সূত্রে 'গদামালিক সম্বাদ' কাব্যে উক্ত হয়েছে, 'রোযা দ্বীনের টাটি জানিও নিশ্চিত'।[১৩] ষোড়শ শতকের পাচালী রচনার বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কবি তখনকার দিনের শাস্ত্রির ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হলেও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ অভিজ্ঞতার চিত্র এঁকেছেন। মুসলমানদের অন্যতম স্তম্ভ রোযা প্রতিপালনের আগ্রহ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে লিখেন–

'বড়ই দানিশমন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোযা নাহি ছাড়ে।'

মির্জা নাথনের সুলিখিত গ্রন্থ 'বাহারস্তান-ই- গায়েবী' ও সমকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় আচারের নানাদিক উঠে এসেছে। তাঁর গ্রন্থে বিশেষতঃ রামাযান ও অন্যান্য উৎসবাদিব বিস্তারিত বর্ণনা মেলে। তিনি লেখেন– রামাযান মাসের সূচনা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ছোট-বড়ো সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাঁবুতে যেতেন। আনন্দ আমেজের মাঝে মাসটি অতিবাহিত করতেন। রামাযান কেবল সংযম, উপবাস ও নামাযের মাসই ছিল না; পরস্পর সাক্ষাৎ আলাপচারিতা ও ভূরিভোজের আয়োজন হত।

রামাযান মাসের শেষে ঈদ-উল-ফিতর পালিত হত। মাথাপিছু ফিতরা আদায় ও তা গরিবদের মাঝে বন্টনের প্রতিযোগিতা চলতো। ত্রিশ দিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে সম্পন্ন হওয়া রোযা যাতে অকার্যকর কিংবা ঝুলন্ত অবস্থায় না থাকে এ জন্য ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে

[১০] Abu Umar Minhajuddin Uthman bin Siraj uddin of juzan, *Tabakat-i-Nasiri,* 2 Vols, Eng.tr.b.y h Raverty, indian Reprint, New Delhi : Orientant Book Reprint, 1970।

[১১] ড. মো. ওসমান গনী- প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

[১২] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩-১৮৫।

[১৩] আহমাদ শরীফ, *মধ্য যুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৩৯১।

ফিতরা বের ও বন্টন করা ইসলামে অপরিহার্য কর্তব্য। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, মহান আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় না করলে তার রোযা জমিন ও আসমানের মধ্যভাগে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায়। অনুরূপ সুনান আবূ দাঊদ-এর হাদীসে পাওয়া যায়– 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, অবশ্য অশ্লীল বেহুদা কথা হতে রোযাকে পাক পবিত্র করার জন্য মহান আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতরা প্রদান করা ফর্‌য করে দিয়েছেন। তিনি গরিব দুঃখী, অনাথ-এতিম, মিসক্বীনদের জন্য সাময়িক খাদ্যরূপে পরিগণিত করেছেন।

উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি এই ফিতরা নামাযের পূর্বে আদায় করলো তার জন্য রোযার যাকাত আদায় হয়ে গেল। আর যারা নামাযের পরে ফিতরা আদায় করলো তারা সাধারণ সাদাক্বাহ্ দান করল, তাদের রোযার ফিতরা আদায় হয় না।

উল্লিখিত আহকাম অনুকরণে চন্দ্রোদয় সাপেক্ষে রামাযানের রোযা সম্পন্ন হত, ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের মাঝে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে যেত। রাজকীয় বাজনা বেজে উঠতো। আগ্নেয়াস্ত্র ও ভারী কামানের ক্রমাগত অগ্নি উদগীরণে মনে হত এ যেন ভূমিকম্প।[১৪] এতে ঈদের আগমন প্রতিভাত হত। প্রত্যেকে এ দিনে উৎকৃষ্ট পোশাকে সজ্জিত হয়ে[১৫] প্রভাতে ঈদগাহে[১৬] শোভাযাত্রা সহকারে গমন করতেন। ঈদগাহে গিয়ে বিরাট জামা'আতে ঈদের নামায পড়তেন। নির্মল আমোদ প্রমোদের সাথে সর্বত্র পরস্পরে অভিনন্দনের দ্বারা আনন্দে মুখরিত হত। ❑

[১৪] Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybl, vol. 1,* tr. by m 1 Borah, utauhati 1936, p 110।

[১৫] Mohammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengle, vol. 1,* Karachi 1967, p. 251।

[১৬] শহরের কিংবা গ্রামের বাইরে সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামের উঁচু সমতল মাঠে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হত। ঈদের মাঠগুলো সাধারণত পশ্চিম দিক দেয়াল ঘেরা ও পূর্বদিকে উন্মুক্ত থাকত। দ্র. Mohammad Mohar Ali, *History of The Muslims in Bengal,* Vol. 13, p. 821; মুনতাসির মামুন, *বাংলাদেশে উৎসব, ঢাকা ১৯৯৪*, পৃ. ২১; Muhammad Yasin, A Social History of Islamic India, Lucknow 1958, p।

সুন্নাহর আলোকে ফিতরা আদায়ের...

[১৬ পৃষ্ঠার পর]

৫. মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ড. মুহাম্মাদ বিন সা'ঈদ রাসলান (হাফিযাহুল্লা-হ) (জন্ম : ১৯৫৫ খ্রি.) বলেছেন,

وقال الجواز- كما مر لإخراج زكاة الفطر- قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأسبوع أو أسبوعين. والأحناف يرون أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان، فكيف تكون طعمةً للمساكين في يوم العيد، وكيف تكون إغناءً؟!

"ফিতরা আদায়ের জায়িয সময় ঈদের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে, এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পূর্বে নয়। হানাফীরা এ মত পোষণ করে যে, রামাযানের প্রথম দিন থেকেই ফিতরা আদায় করা জায়িয। তাহলে কীভাবে তা ঈদের দিন মিসকীনদের খাদ্যস্বরূপ হয়? আর কীভাবে তা (ঈদের দিন) অভাবমুক্তকারী হয়?!"[১৭]

৬. মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য আশ-শাইখ, আল-'আল্লামাহ, আল-ফাক্বীহ ড. মুহাম্মাদ বিন 'উমার সালিম বাযমূল (হাফিযাহুল্লা-হ) বলেছেন,

والذي يترجح عندي والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

"আমার কাছে যে মতটি অগ্রগণ্য আর প্রকৃত 'ইল্‌ম তো মহান আল্লাহর কাছে, তা হলো– ঈদের নামাযের এক দিন বা দুই দিনের চেয়ে বেশি পূর্বে ফিতরা আদায় করা জায়িয নয়। আর এটাই মালিকী এবং হাম্বলীদের মাযহাব।"[১৮]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলো যে, ঈদের এক দিন বা দুই দিন আগে ফিতরা দেওয়া জায়িয আছে, তবে ঈদের দুই দিনের চেয়ে বেশি আগে ফিতরা আদায় করা জায়িয নয়। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বিষয় জানার এবং তা মানার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। ❑

[১৭] *ফাদ্বলুল 'আশরিল আওয়াখিরি ওয়া লাইলাতিল ক্বাদ্‌র ওয়া আহকামু যাকাতিল ফিতুর- 'আল্লামাহ মুহাম্মাদ রাসলান (হাফিযাহুল্লা-হ), পৃ. ৬২, শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত সফট কপি।*

[১৮] *আত্ তারজীহু ফী মাসাইলিস সাওমি ওয়ায যাকাত- শাইখ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লা-হ), পৃ. ১৭১, দারুল হিজরাহ, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি., ১ম প্রকাশ।*

যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন : কিছু প্রস্তাব

লেখক : প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

শিক্ষা কমিশন একটি দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে গঠিত উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি। সাধারণত দেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ প্রধান এবং অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে স্থান কাল পাত্র পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কেমন হবে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

সাধারণত একটি কমিশনে প্রণীত শিক্ষা নীতি দুই থেকে দশ বিশ বছরেও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ধর্ম দেশ জাতি সমাজ ইত্যাদির সাথে শিক্ষানীতি সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় না থাকলে সরকার পরিবর্তনেও সে শিক্ষানীতি পরিবর্তন করা হয় না সাধারণত।

সরকার নির্বাচিত হলে সাধারণত তাদের ভিশন মিশন ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য নতুন করে তারা শিক্ষা কমিশন গঠন করে থাকে। এ মিশন ভিশন বাস্তবায়নে অনেক সময় শিক্ষানীতির 'আমল পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা কমিশন কোন স্তরের জন্য : সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মৌলিক বিষয়গুলো কমিশনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

কমিশনের সদস্য : সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা প্রফেসর পণ্ডিতদেরকে নিয়েই একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। যাতে তারা তাদের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বাস্তবতা দেশের প্রেক্ষাপটসহ ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মেধা যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সঠিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেন। তবে দলীয় সরকারের অধীনে অনেক কম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রফেসর এবং শিক্ষাবিদও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি আচার-আচরণ চালচলন ওঠা বসা খাওয়া-দাওয়া রাষ্ট্রসমাজ এক কথায় সবকিছুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত কিছু ঘটলে সেটাই হবে অস্বাভাবিক।

আর এই প্রতিফলন ঘটাতে যারা পারঙ্গম তারাই হবেন এই শিক্ষা কমিশনের সদস্য।

উপকমিটি : মূল কমিটির অধীনে অনেকগুলো উপকমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। বিষয়ভিত্তিক পণ্ডিত অধ্যাপকদের নিয়ে এই উপকমিটি গঠন করা হয়, যাতে সে বিষয়ে কমিশনে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সুপরামর্শ দিতে পারেন যার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হতে পারবে।

সিলেবাসের মূল লক্ষ্য : সিলেবাস হলো একটি বাড়ি নির্মাণের মূল পরিকল্পনা তথা মাস্টার প্লান। মাস্টার প্লানে যেকোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে সে বিল্ডিংটি যেমন টেকসই হয় না তেমনি সিলেবাসে যে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে সে সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট নিয়ে সে শিক্ষার্থী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে না; অকালেই ভেঙে পড়বে দেশ জাতির মেরুদণ্ড। তাই সিলেবাসের মূল লক্ষ্য হলো এটি এমনভাবে প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশ প্রেমিক ধার্মিক এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে।

সিলেবাস প্রণয়নে লক্ষণীয় বিষয় : মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো শিক্ষা। এটাই জাতির মেরুদণ্ড এর উপরে নির্ভর করছে দেশের ভূত ভবিষ্যৎ। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

১. মূল কমিটি গঠন : বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে প্রথমে একটি সিলেবাসের মূল কমিটি গঠন।

২. বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ : বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সে বিষয়ে এর দায়িত্ব প্রদান।

৩. এনসিটিবিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ : এনসিটিবির কর্মকর্তাগণ বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হবেন। এতে এমন ধরনের লোকদের যুক্ত না করি যারা দেশ জাতির চাইতে নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখেন।

৪. দেশপ্রেমীদের নিয়োগ : দল মত নির্বিশেষে দেশপ্রেমীদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৫. উপদেষ্টা কমিটি গঠন : দেশের বিজ্ঞজনদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা বড় বড় ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আগে থেকেই আলোচনা পর্যালোচনা করে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবেন।

৬. ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান : যেকোনো ধর্মের লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না।

* *আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

৭. সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম সংস্কৃতির আলোকে সিলেবাস প্রণয়ন : সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম সংস্কৃতির আলোকে তাদের পাঠ্যপুস্তকসহ সকল কিছুই পরিচালিত হবে এ বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান সিলেবাস পর্যালোচনা : এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারা বিদ্যমান, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা।

এ দেশে ৯০% মুসলমানের বাস। স্বভাবতই তারা মুসলমানদের ঈমান 'আক্বিদাহ্ দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করুক এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুক সেজন্য যুগ যুগ ধরে তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা বেকার থাকুক দেশ-জাতি সমাজের উন্নয়নে তাদের কোনো অবদান না রেখে তারা দেশ জাতির বোঝা হয়ে থাকুক এটা কারোরই কাম্য নয়।

তাই যুগে যুগে মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

উচ্চতর/বিশ্ববিদ্যালয় : দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম বিধায় পাঠ্যপুস্তকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের প্রতিটি বিভাগে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে দু'টি পত্র বাধ্যতামূলক থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।

১. কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে প্রস্তাবিত কোর্সগুলো হলো– ইসলামে অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ইসলামে সমাজ ব্যবস্থা, আল-কুরআনে প্রত্নতত্ত্ব, আল-কুরআনে নীতি দর্শন, আল-কুরআনে ইতিহাস দর্শন, আল-কুরআনে ব্যক্তি দর্শন, আল-কুরআনে পরিবার ও পারিবারিক দর্শন, আল-কুরআনে সমাজ দর্শন, আল-কুরআনে রাষ্ট্র দর্শন, আল-কুরআনে পররাষ্ট্র নীতি, আল-কুরআনে সমর দর্শন, আল-কুরআনে শিক্ষা দর্শন, আল-কুরআনে গবেষণা পদ্ধতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

এক. কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হলে কলা ও বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী শিক্ষাকে সমান্তরালে রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৬টি বিভাগের মধ্যে মাত্র ১টি ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আর বাকিগুলো কলা বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক। এসব সাবজেক্টগুলোতে অন্তত ২/৪টি করে নিম্নের কোর্সগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেত। যেমন–

২. বাণিজ্য অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে প্রস্তাবিত কোর্সগুলো হলো– ইসলামে বণ্টন ব্যবস্থা, ইসলামে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ইসলামে কর ও ট্যাক্স ব্যবস্থা, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য, আল-কুরআনে বাণিজ্যনীতি, আল-কুরআনে ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি।

৩. আইন অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে প্রস্তাবিত কোর্সগুলো হলো– ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, ইসলামে উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি।

৪. বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে প্রস্তাবিত কোর্সগুলো হলো– আল-কুরআনে প্রাণী বিজ্ঞান, আল-কুরআনে কীটপতঙ্গ, আল-কুরআনে খেচর, আল-কুরআনে ভূ-বিজ্ঞান, আল-কুরআনে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, আল-কুরআনে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, আল-কুরআনে মহাকাশ বিজ্ঞান, আল-কুরআনে সৌরবিজ্ঞান, আল-কুরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আল-কুরআনে পরিবেশ বিজ্ঞান, আল-কুরআনে আবহাওয়া বিজ্ঞান, আল-কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান, আল-কুরআনে কম্পিউটার বিজ্ঞান, আল-কুরআনে সংখ্যা তত্ত্ব, আল-কুরআনে সময় তত্ত্ব, আল-কুরআনে পুষ্টি বিজ্ঞান, আল-কুরআনে খাদ্য বিজ্ঞান, আল-কুরআনে প্রযুক্তি বিজ্ঞান, আল-কুরআনে পদার্থ বিজ্ঞান, আল-কুরআনে জলযান, আল-কুরআনে স্থলযান, আল-কুরআনে আকাশযান, আল-কুরআনে জড় বিজ্ঞান, আল-কুরআনে প্রকৌশল বিজ্ঞান, আল-কুরআনে চর্মপ্রযুক্তি, আল-কুরআনে স্থাপত্য বিদ্যা, আল-কুরআনে খনিজ বিজ্ঞান, আল-কুরআনে কৃষি বিজ্ঞান, আল-কুরআনে হাজবেন্ডারী, আল-কুরআনে সামুদ্রিক বিজ্ঞান, আল-কুরআনে মৎস্য বিজ্ঞান, আল-কুরআনে সৃষ্টিতত্ত্ব, আল-কুরআনে শরীর তত্ত্ব, আল-কুরআনে ভ্রূণ তত্ত্ব, আল-কুরআনে মনোবিজ্ঞান, আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি।

ফলে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলে ইসলাম এবং আল-কুরআনে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে আল-কুরআনের আলোকে নিজেকে যেমন ঢেলে সাজাতে পারবেন তেমনি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকেও সুসংহত করতে পারবেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবনা : আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তবে সবগুলোই বিজ্ঞান বিষয়ভুক্ত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সাধারণ জ্ঞানের সাথে ইসলামের শিক্ষার সমন্বয় করে নতুন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। যে শিক্ষা লাভ করে দেশে এমন সুনাগরিক গড়ে উঠবে যারা হবে মুসলিম জাতির জন্য বড় সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষায়িত করতে শুধু একটি অনুষদ থিওলজি না রেখে ১১টি থিওলজী অনুষদকে অনায়াসেই নিম্নের শিরোণামে ১১টি অনুষদে রূপান্তরীত করা যেতে পারে। যা মদীনাসহ বিশ্বের কয়েকটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অনুষদ রয়েছে। *[৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

সুন্নাহর আলোকে ফিতরা আদায়ের সঠিক সময়

–আবু লাবীবা মুহাম্মাদ মাকসুদ*

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। শতসহস্র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রাণ প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্ধারিত উৎসবের দিন ঈদুল ফিতরের প্রথম কর্ম হচ্ছে সাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করা। তবে এর আদায়ের সময় নিয়ে মুসলিম সমাজে মতপার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে সুন্নাহর আলোকে ফিতরা আদায়ের সঠিক সময় নিয়ে দলিলভিত্তিক পর্যালোচনা করা হলো।

ইমাম ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "ফিতরা আদায় করার দু'টো সময় রয়েছে। যথা- **(১) বৈধ সময় :** আর তা হলো ঈদের এক দিন বা দুই দিন আগে, **(২) উত্তম সময় :** আর তা হলো ঈদের দিন ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে।"[১৯]

সুতরাং বুঝা গেল যে, ফিতরা আদায় করার দু'টো সময় আছে। আমরা এ ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে দলিল বর্ণনা করছি।

১. বৈধ সময় : ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে ফিতরা আদায় করা জায়িয। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে (তাঁর 'আমল) বর্ণিত হয়েছে–

أَنَّهُمْ كَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبلَ الفِطرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

"তিনি ফিতরার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে ফিতরা দিতেন, ঈদের এক দিন বা দুই দিন পূর্বেই।"[২০]

২. উত্তম সময় : ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করা উত্তম। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লোকজনের ঈদের নামাযে বের হবার পূর্বেই ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২১]

এখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ নিয়ে আলোচনা করব ইন্‌শা-আল্লাহ। মাসআলাটি বৈধ সময়ের আগেই তথা ২৮ রামাযানের আগেই ফিতরা আদায় করার বিধান প্রসঙ্গে। আমাদের উল্লিখিত বৈধ সময়ের আগে ফিতরা আদায় করা যাবে কি না তা নিয়ে আলেমগণ তিনটি প্রসিদ্ধ মতে মতানৈক্য করেছেন। যথা-

১. ফিতরা ঈদুল ফিতরের এক দিন বা দুই দিনের চেয়ে বেশি আগে বের করা জায়িয নয়। এটি মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের মত।

২. নিঃশর্তভাবে সময় হওয়ার আগেই যে কোনো সময় ফিতরা আদায় করা জায়িয। এটি হানাফী মাযহাবের মত।

৩. নিঃশর্তভাবে রামাযান আসার পর যে কোনো সময় ফিতরা আদায় করা জায়িয। এটি শাফি'ঈ মাযহাবের মত।[২২]

এক্ষেত্রে আমরা প্রথমোক্ত মতটিকে প্রাধান্য দিই এবং তা সঠিক বলি। আর আমরা তা বলি বেশ কয়েকটি গ্রহণযোগ্য কারণে। তার মধ্যে কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

এক. রাসূল (ﷺ) স্পষ্টভাবে ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৩] তবে সাহাবীগণের কর্ম ও রাসূল (ﷺ)-এর যুগের 'আমল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে ফিতরা দেওয়ার অনুমতি আছে। যেমন- নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

"ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ঈদের এক দিন ও দুই দিন পূর্বেই ফিতরা আদায় করতেন।"[২৪]

দুই. ফিতরাকে 'যাকাতুল ফিত্বর' তথা 'রোযা ভাঙার যাকাত' বলা হয়। কেননা রামাযানের রোযা ভাঙার কারণে ফিতরা ফরয হয়। আর রামাযানের রোযা ভাঙা বা সমাপ্ত করা হয় মাসের শেষে। সুতরাং মাস শেষ হওয়ার আগে ফিতরা বের করা ফিতরাকে আবশ্যককারী বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ফিতরা বের করা জায়িয সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব এর চেয়ে বেশি আগে বের করা যাবে না।

---

* *শিক্ষক, মাদ্‌রাসা 'ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্, রাণীবাজার, রাজশাহী। শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী মহানগর শাখা।*

[১৯] *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল- ইমাম ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ১৮, পৃ. ২৬৬, দারুস সুরাইয়্যা, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি., ১ম প্রকাশ।*

[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১।*

[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪।*

[২২] *আত্ তারজীহু ফী মাসাইলিস সাওমি ওয়ায যাকাত- শাইখ মুহাম্মাদ বাযমূল (হাফিযাহুল্লা-হ), পৃ. ১৭১, দারুল হিজরাহ, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি., ১ম প্রকাশ।*

[২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫০৩।*

[২৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬১০, সনদ সহীহ।*

তিন. ফিতরা ফর্‌য হওয়ার হিকমাহ হলো– রোযা অবস্থায় কৃত অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচরণ থেকে রোযাদারকে পবিত্র করা এবং মিসকীনদের আহারের সংস্থান করা। তাই রামাযানের শুরু বা মাঝের দিকে ফিতরা আদায় করলে তা উক্ত হিকমাহ'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না; বরং মাসের শেষে আদায় করাই উক্ত হিকমাহ'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এখন আমরা আমাদের অগ্রাধিকার দেওয়া মতটির সপক্ষে আহলুস সুন্নাহ'র আলেমদের কিছু বক্তব্য পেশ করব। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক্ব।

১. সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ ও মুহাদ্দিস শাইখুল ইসলাম ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) বলেছেন,

والواجب أيضًا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

"ঈদের নামাযের আগে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত দেরি করে ফিতরা আদায় করা জায়িয নয়। তবে ঈদের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে ফিতরা বের করায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এর মাধ্যমে জানা যায়, আলেমদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতানুসারে ফিতরা বের করার প্রথম সময় হলো ২৮ রামাযানের রাত। কেননা মাস ত্রিশে হয়, আবার ঊনত্রিশেও হয়। রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবিগণ ঈদের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে ফিতরা বের করতেন।"[২৫]

২. বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ আশ্‌ শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) বলেছেন,

ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمُها زكاةَ الصيام.

"ঈদের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা জায়িয। এরচেয়ে বেশি পূর্বে আদায় করা জায়িয নয়। কেননা এটাকে যাকাতুল ফিত্বর বা রোযা ভাঙার যাকাত বলা হয়, আর তা ফিত্বর তথা রোযা ভাঙার দিকে সম্বন্ধিত করে বলা হয়। আমরা যদি রামাযান মাস প্রবেশ করা মাত্র ফিতরা বের করা জায়িয বলি, তাহলে এর নাম 'যাকাতুস সিয়াম' তথা 'রোযার যাকাত' (রাখাই সার্থক) হতো।"[২৬]

৩. ইমাম ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,

مسألة : لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟ الجواب : لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانًا أن الوقت قد دخل.

"একটি মাসআলাহ : কেউ যদি ২৭ রামাযানে ফিতরা আদায় করে, অথচ মাস সম্পূর্ণ হয়; তবে কি তা তার জন্য যথেষ্ট হবে? এর উত্তর হলো– যথেষ্ট হবে না। সে ওই ব্যক্তির মতো, যে ওয়াক্ত আসার আগেই এটা ভেবে নামায পড়ে নেয় যে, ওয়াক্ত বোধহয় এসে গেছে।"[২৭]

৪. সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ) (জন্ম : ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খ্রি.) বলেছেন,

أما لو أخرجها قبل اليومين من آخر الشهر؛ فإنها لا تجزئه؛ لأنه لم يأت وقت الوجوب؛ ولأن هذا لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخرجونها قبل اليومين من آخر الشهر.

"পক্ষান্তরে সে যদি মাস শেষ হওয়ার (অর্থাৎ- ঈদের) দুই দিন পূর্বে ফিতরা বের করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা এখনও (ফিতরা) ওয়াজিব হওয়ার সময় উপস্থিত হয়নি। আর যেহেতু সালাফদের থেকে এটা জানা যায় না যে, তাঁরা মাসের শেষদিক থেকে (অর্থাৎ- ঈদের নামায থেকে) দুই দিনের আগে ফিতরা বের করতেন।"[২৮] *[১২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

[২৫] *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যা' আহ- ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ১৪; পৃ. ২০১-২০২, দারুল ক্বাসিম, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪২০ হি., ১ম প্রকাশ।*

[২৬] *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল- ইমাম ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ১৮; পৃ. ২৭০, দারুস সুরাইয়্যা, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি., ১ম প্রকাশ।*

[২৭] *আশ্‌ শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুস্তাক্বনি'- ইমাম ইবনু 'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ৬, পৃ. ১৭০, দারুল ইবনিল জাওযী, দাম্মাম ছাপা, সন : ১৪২৪ হি., ১ম প্রকাশ।*

[২৮] *শারহু যাদিল মুস্তাক্বনি'- ইমাম সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ), খণ্ড : ২, পৃ. ২৯৯, দারুল 'আসিমাহ, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, সন : ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি., ১ম প্রকাশ।*

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

–তানযীল আহমাদ*

ভূমিকা

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। সারা বিশ্বের মযলুম শ্রমিকরা এদিনে সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং, প্রতিবাদ সভা ও র‍্যালি বের করাসহ নানান কর্মসূচি পালন করে থাকে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক নেতারাও সে সকল সভা-সমিতিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে অশিক্ষিত শ্রমিকদের করতালির আশায় তাদের পক্ষে গলা উঁচিয়ে, বুক ফুলিয়ে, হস্তদ্বয়ের বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গিমাসহ তেজস্বী বক্তৃতামালা পেশ করে থাকে। তাদের সে সকল বক্তৃতার চুম্বুকাংশ নোট করে আমাদের অতি আপনজন সাংবাদিক ভাইয়েরা খবরের কাগজে ছাপানোর মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। পরের দিন প্রভাতে খবরের কাগজে এসব অগ্নিঝরা বক্তব্য পাঠ করেই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধার নানাবিধ আশ্বাসের বাণী তুলনামূলক কোমল কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থ বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো জ্ঞান না থাকায় শ্রমিকদল তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি শ্রম দিতে শুরু করেন। দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে শ্রমিক যখন তার বেতন-ভাতা বৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর থাকে তখন তাদের কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে মালিকপক্ষ নাইট ক্লাবে ফুর্তি করে। একদিকে ঝড়ো বৃষ্টির রাতে শ্রমিকের থাকার জায়গা হয় না, অন্যদিকে মালিকপক্ষের শ্বেতপাথরের সুরম্য অট্টালিকা আকাশ ছুঁতে থেমে থাকে না। একদিকে দরিদ্র শ্রমিকের অসহায় মা-বাবা চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, অন্যদিকে বড়োলোক মালিক তার শরীরের চেকআপের জন্য প্রতি মাসে মাউন্ট এলিজাবেথে যায়। যখন অর্থাভাবে শ্রমিকের ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, তখন মালিকের ছেলে-মেয়ে পড়াশুনার জন্য আমেরিকা-ইউরোপে পাড়ি জমায়। একদিকে শ্রমিক তার মৃত মা বাবার দাফন কাফনের খরচের জন্য হিমশিম খায়, অন্যদিকে মালিক তার মৃত মা বাবার জন্য কুলখানি করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

আমাদের সমাজ জীবনে এমনই উন্নতির জোয়ার বইছে। তৈলাক্ত মস্তকে তৈল মর্দনের যে সামাজিক চিত্র আমরা প্রতিনিয়ত অবলোকন করে চলছি তা কতদূর পর্যন্ত গড়াবে সেটাই আজকের চিন্তার বিষয়।

প্রেক্ষাপট

১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়ে আসছে। এর আগে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগোতে হে মার্কেটের সামনে দৈনিক আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর গুলিতে সে দিন ১০/১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১লা মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

পুঁজিবাদের অভিশাপ

মূলত শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution)-এর দিকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্র যাত্রা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে গির্জার পোপ ও ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীদের মাঝে শুরু হয় আদর্শিক সংঘর্ষ। একপর্যায়ে গির্জার অনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে সেখানে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। কৃষি ব্যবস্থা থেকে শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকে যায় ইউরোপ। যে ভূমিতে একসময় সবুজ শষ্যাদি আবাদ হতো, সেখানে এখন বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করল। ধ্বংস হলো কুটির শিল্প। শিল্পপতিরা তাদের সমস্ত অর্থ ইনভেস্ট করতে থাকল সেসব কারখানায়। কৃষকদের আবাদি জমিন কেড়ে নেয়া হলো, কুটির শিল্পের মালিকরা সর্বস্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে জীবিকার তাগিদে তারা শহরমুখী ও কারখানায় কাজ করার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল সমাজের বুর্জেয়া শ্রেণি। নামমাত্র বেতনে শ্রমিকদের গাধার মতো খাটাতে শুরু করল তারা। আর করবেই না কেন? সমাজের এ সকল বুর্জোয়া শ্রেণির বিশ্বাস তাদের অকুণ্ঠ সমর্থক ম্যানডেভিলের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে–

* *সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

"গরিবদের থেকে কাজ নেয়ার একটিই মাত্র পথ, আর তাহলো এদেরকে গরিব থাকতে দাও, এদেরকে পরনির্ভরশীল করে তোলো। এদের প্রয়োজন খুব অল্প করেই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজন পূরণে এদেরকে স্বাবলম্বী করা চরম বোকামি।"

পুঁজিবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা টাউনসেন্ড উক্ত ঘৃণ্য মনোভাবটি আরো সোচ্চার করতে যেয়ে বলেন,

"ক্ষুধার কষাঘাত এমন এক মারাত্মক অস্ত্র যা বন্য হতেও অবাধ্য পশুগুলোকে শান্ত-সুবোধ বানিয়ে ফেলে। এরই সাহায্যে অবাধ্য হতে অবাধ্যতর মানুষও বাধ্য ফরমাবদার হয়ে ওঠে। তাই তোমরা গরিবদের থেকে যদি কাজ নিতে চাও তবে এর একমাত্র উপায় এদেরকে 'ভুখা' রাখো। ক্ষুধাই এমন এক আবেদনময়ী বস্তু যা গরিব ও সর্বহারাদেরকে যে কোন রকমের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।"[২৯]

শ্রমিকদের এমন করুণ দশা ও স্বল্প বেতনের অভিযোগে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বন্দ শুরু হয়। কিন্তু কথায় বলে, 'টাকায় বাঘের চোখও মেলে'। রাজনৈতিক নেতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য বুর্জোয়া মালিকপক্ষের কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগদান করে আবার তাদের পকেট ভর্তি করার মাধ্যমে তাদরেকে খুশিও রাখে। এভাবে শিল্পপতিদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সখ্য গড়ে ওঠে। ফলে স্বভাবতই শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। শিল্পায়ন ও রাজনীতির হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদ। মেহনতি মানুষের রক্তে গড়ে ওঠে শিল্পপতিদের অট্টালিকা। অবস্থা এত বেগতিক হয় যে, কোনো পণ্য বেশি উৎপাদন হলে তা ধ্বংস করা হতো, যেন বাজারে তার সহজলভ্যতা না হয়। যেহেতু বাজারে কোনো পণ্যের সহজলভ্যতা হলে মুনাফাখোরিরা তাদের ইচ্ছামত সেটার অতিমূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন না। এজন্য একবার ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হলো। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু বুর্জোয়ারা পড়ে গেল চিন্তায়। কারণ এত ফসল বাজারে উঠলে তাদের মজুতদারি করেও কোনো কাজ হবে না। তারা সিদ্ধান্ত নিলো এগুলোকে কিভাবে নষ্ট করা যায়? এত ফসল মাটিতে পুঁতে ফেলাও সম্ভব না আবার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়াও যাবে না। অবশেষে তারা উৎপাদিত ফসলকে পুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো। দুই লাখ পাউন্ড জ্বালানি তেল ব্যবহার করে ব্রাজিলে উৎপাদিত ফসলকে তারা পুড়িয়ে ফেলল। অরেকবার খাদ্য সংকট তৈরির জন্য তারা লিভারপুলের ২০০ নৌকা ডুবিয়ে দেয়।[৩০]

সোশ্যালিজমের ব্যর্থ চেষ্টা

সাদা চামড়ার সাম্রাজ্যবাদীরা পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে গোটা শ্রম বাজারকে পরোক্ষভাবে করায়ত্ত করে। শ্রমিকের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। এদিকে রাশিয়ায় শ্রমিকের উপর নির্যাতন আরো বৃদ্ধি পায়। দৈনিক আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তাদের। যুবক ও শিশু শ্রমিকের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। একজন মহিলা শ্রমিককে তার গর্ভাবস্থায়ও কাজ করতে হয়। ফলে মার্কসীজম সেখানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। মার্কসীজমের মূল কথা হলো, যার যার সাধ্য অনুযায়ী কাজ আদায় করে নিতে হবে আর তার প্রয়োজন মাফিক তাকে অর্থ যোগান দিতে হবে। প্রথম প্রথম এই মতটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। লাল চামড়ার রাশিয়ানরা এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে খুব গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে থাকে। রাশিয়ার শ্রমিকদের নিকটে কাল মার্কস হয়ে ওঠেন এক সংগ্রামী প্রতীক। পরবর্তীতে লেলিন সেই মতবাদকে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র রাশিয়ার সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শিষ্যরা কখনো একথা ভাবেনি যে, কাল মার্কসের এই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও তাদের চিরস্থায়ী কোনো সমাধান হবে না। শ্রমিকদের শুধু প্রয়োজন মিটলে তারা আজীবন বংশপরম্পরায় শ্রমিকই থেকে যাবে। তাদের মালিক হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝে যে সমস্যা তা বন্ধ হবে না। এজন্যই মনে হয়, রাশিয়ায় ১৯৩৬ সালে পূর্বের আইন পরিবর্তন করে নতুন আইন পাস করা হয়। নতুন আইনে বলা হয়, শ্রমিকের নিকট থেকে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ আদায় করতে হবে এবং তার কাজের পরিধি ও গুণগত মান বিবেচনা করে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু রাশিয়ান আইন প্রণেতা সোশ্যালিজমের বোদ্ধারা টের পেয়েছেন কিনা যে, তাদের

[২৯]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ৭ পৃ.।*

[৩০]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ৫ পৃ.।*

এই আইনে পুঁজিবাদেরই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কার্যত, যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কাল মার্কস সংগ্রাম করেছেন এবং তার ভাবশিষ্য লেলিন জেল খেটেছেন সেই পুঁজিবাদের দিকেই তাদের অনুসারীরা মোড় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে আমরা ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে চাই, ভারতের প্রখ্যাত 'আলেমে দ্বীন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি বর্ণনা করেছেন :

'আমি রাশিয়া সফরকালে লেলিনের সাথে সাক্ষাৎ হলে কথা প্রসঙ্গে তার কাছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করি।

"ইয়াসআলুনাকা মাযা ইয়ুনফিকুন কুলিল আফওয়া।"

"হে নবী! তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছুই।"

তখন লেলিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন– "আরো আগে যদি কুরআনের এই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোনো আবশ্যক ছিল না।"[৩১]

যাই হোক, শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্বে পরপর দু'টি মতবাদ, তথা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ তর্জন-গর্জন করলেও আধুনিককালে তাদের মতবাদের অসারতা আবারো প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই বোধ হয় এ যুগে এসেও শ্রমিকদেরকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়। পাওনা মজুরির জন্য মালিকপক্ষের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সরকারের পোষ্যবাহিনী নানা ধরনের উপঢৌকন প্রেরণ করে থাকে। ফলে আধুনিক বিশ্বের সকল সম্পদ মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ লোকের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। অর্থাৎ- বিশ্বের সাতশ কোটি মানুষ মাত্র দশ ভাগ লোকের নিকটে জিম্মি।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামের এমন কিছু সৌন্দর্যপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা পেশ করেছে, যা বিশ্বের কোটি কোটি মযলুম মেহনতি শ্রমিকের সামনে আলোর দ্যুতি ছড়াবে। নিরাশার চাদরে ঢাকা খেটে খাওয়া নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের সামনে আশার প্রদীপ হয়ে থাকবে। কিন্তু ইসলামের নাম শুনলেই একশ্রেণির লোকদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। ইসলামের সুনির্মল, স্বচ্ছ ও কালজয়ী আদর্শের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করাই তাদের কর্মসূচি। ফলে ইসলামের শ্রমব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমুখী হলেও তা তাদের সহ্য হয়নি, হবেও না। বঞ্চিত মানুষের পক্ষে ইসলামের যে দরদমাখা অবস্থান তা যদি তারা মেনে নিত তাহলে কতই না ভালো হতো! আমরা যদি ভারতে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে সাদা চোখেই দেখতে পাব, ইসলাম আগমনের প্রাক্কালেই এখানকার দলিত সম্প্রদায় ও নিম্নশ্রেণির দরিদ্ররাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্পেনে মুসলিমদেরকে শ্রমিকশ্রেণিই স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি মক্কায় ইসলামের সূচনালগ্নে দাস ও দরিদ্রশ্রেণিই তা গ্রহণ করেছিল। ইসলামে মানবাধিকারের সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন সাহাবি জাফর ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী তাকে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন,

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذٰلِكَ حَتّٰى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُوْلًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، «فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّوْرِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيْمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ.

অর্থ : হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কর্মকাণ্ডে ডুবে ছিলাম ও প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। আর আমাদের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বলদেরকে বঞ্চিত করে রাখত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকটে আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন– যার বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আমরা সম্যক অবগত। তিনি আমাদেরকে মহান

[৩১]. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার- ১৪ পৃ.।*

আল্লাহর ‘ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যে গাছ পূজা ও পাথর পূজা করত তা থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে বলেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন সত্য বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে। তিনি নিষেধ করেছেন হারাম কাজে লিপ্ত হতে, রক্তপাত করতে, অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়তে, মিথ্যা বলতে, ইয়াতিমের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করতে এবং সতী-সাধ্বী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিতে।[৩২]

এই হাদীস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, সাহাবি জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন খ্রিষ্টান শাসকের নিকটে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন মানবতাবাদী হিসেবে। যিনি মানুষকে ভালো আচরণের কথা বলেন, আমানত রক্ষার সদুপদেশ দেন, সত্যের নির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং তিনি তার অধিনস্তদের সাথে কিরূপ আচরণ করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আসুন আমরা জেনে নেই দুনিয়ার মযলুম মেহনতি মানুষের জন্য মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছেন–

০১. মালিক শ্রমিক ভাই ভাই : একদা আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার এক দাসকে ভর্ৎসনা করলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, হে আবূ যার! তুমি এমন একজন ব্যক্তি যার মাঝে এখনো জাহিলি স্বভাব বিদ্যমান। এরপর তিনি বলেন :

«إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ».

‘নিশ্চয় তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপরে তোমাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন।’[৩৩]

উল্লিখিত হাদীসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন :

- দাস, শ্রমিক বা অধস্তন কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা জাহিলী স্বভাব।
- মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই ভাই।

০২. শ্রমিকের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে : সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দশ বছর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে বলেননি যে, তুমি কেন এটি করলে আর কেন এটি করলে না![৩৪]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল, আমার এক দাস রয়েছে। সে আমাকে বিরক্ত করে ও গালি দেয়। আমি কি তাকে প্রহার করতে পারব? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

تَعْفُوْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

‘তুমি প্রতিদিন তাকে সত্তর বার ক্ষমা করতে থাকো।’[৩৫]

০৩. মালিক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান : ইসলামের সাম্যনীতি আসলেই অবাক করার মতো। সেই যুগে ক্রীতদাসের যে করুণ অবস্থা বিরাজিত ছিল সে কঠোরনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

‘তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের সেবক। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার অধীনে কোনো সেবক রয়েছে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে যেন সেই মানের পোশাক পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে।’[৩৬]

ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যেখানে শ্রমিকদের পক্ষে এমন সমতার কথা বলা হয়েছে।

০৪. শ্রমিকের নির্ধারিত বেতন ছাড়াও উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ দেয়া : নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ».

‘যখন তোমাদের খাদেম খাবার নিয়ে আসে তখন যেন সে তাকে তার সাথে বসায় অথবা তার হাতে খাবার তুলে দেয়। কেননা খাবার তৈরির যে তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট তা খাদেমকেই সহ্য করতে হয়েছে।’[৩৭]

এখানে আমরা মাওলানা আব্দুর রহীম (রহিমাহুল্লাহ)-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন,

---

[৩২]. *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৭৪০।*
[৩৩]. *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫০৬৭, মা. শা., হা. ৫১৫৭, সহীহ।*
[৩৪]. *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৬৮।*
[৩৫]. *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৫৬৩৫, সহীহ।*
[৩৬]. *সহীহুল বুখারী- হা. ৩০।*
[৩৭]. *সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩২৯১।*

‘এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিজের শ্রমের সাহায্যে মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটাইয়া যাহা উৎপন্ন করিবে, তাহা হইতে তাহাকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার পরও আসল মুনাফা হইতে তাহাকে কিছু না কিছু অংশ দিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত ঘরের বাবুর্চি আর কারখানার শ্রমিকের মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। একজন বাবুর্চিকে খাদ্য পাকাইবার কাজে যেভাবে মনোযোগ দিতে হয়, দেহ ও চিন্তা শক্তিকে যেভাবে নির্দিষ্ট এক কাজের জন্য নিয়োজিত করিতে হয়, কম-বেশি প্রায় তদ্রূপই কারখানার একজন মজুরকেও খাটিতে হয়। কাজেই এই হাদীস অনুসারে নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য হইতে অংশ পাইতে পারিবে। যে মিলে কাপড় তৈরি হয়, প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার পরিবারবর্গের জন্য বৎসরে এক বা একাধিকবার কাপড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কোন মিলে শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া থানকে থান কাপড় বুনে অথচ তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের লোকদের পরিধানে হয়ত ছিন্নবস্ত্রটুকুরও অস্তিত্ব নেই। এই হাদীস অনুসারে ইসলামী সমাজে যে শ্রমনীতি কায়েম করা হইবে তাহাতে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকিতে পারিবে না।’[৩৮]

০৫. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“আল্লাহ তা‘আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না।”[৩৯]

নবী (ﷺ) বলেন,

«وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ».

‘তার সাধ্যশক্তির অতীত কোনো কাজের চাপ যেন তাকে না দেয়। দিলে সে কাজ সমাধা করার ব্যাপারে যেন তাকে যথাযথ সহযোগিতা করে।’[৪০]

সহযোগিতার অর্থ এই নয় যে, আপনাকেই কারখানায় গিয়ে তাদের সাথে কাজ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো– আপনি সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দিবেন, ভালো মানের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করবেন, শ্রমিককে পর্যাপ্ত সময় দিবেন এমনকি তাদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুস্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

উপসংহার

ইসলামের এই শ্রমনীতি যদি মালিকপক্ষ মেনে চলত তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কালমার্কস, লেলিন অথবা মাও সে তুংয়ের ভুয়া কমিউনিজমের জন্য শ্রমিকশ্রেণি এত আন্দোলন, হরতাল, অবরোধ বা ধর্মঘট করত না। তারা ইসলামের ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি মেনে নিয়ে আরামে জীবন-যাপন করতে পারত। কিন্তু কে শুনে কার কথা।

বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অক্টোপাসের মতো মালিকপক্ষের অবস্থাদৃষ্টে অনেক আগে পড়া বাংলাদেশের প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমাদের ফুড কনফারেন্সের গল্পটি মনে পড়ে গেল। গল্পটি মোটামুটি এমন...

সারাদেশে দুর্ভিক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষুধা আর রোগে মানুষ এবং পশুপাখির একাকার অবস্থা। রাজধানী ঢাকায় কাঙ্গালের দল ছুটে এসেছে দু'মুঠো ভাতের আশায়। ভুখা-নাঙ্গা মানুষের কারণে সমাজের সাহেবগণ রাস্তায় বেরও হতে পারছিলেন না। আগে যেখানে গাউন শাড়ি পরা মহিলারা হাঁটত এখন সেখানে অর্ধ উলঙ্গ ছেঁড়া কাপড়ে পল্লীর মা মেয়ের অবস্থান। বাবুরা যেখানে আগে প্রাত্যহিক ব্যায়ামের জন্য গমনাগমন করত এখন সেখানে ভিক্ষুকের দলের প্রচণ্ড ভির। রাজধানীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে পরিবেশবাদীরাও থেমে নেই। এর একটা বিহিত করা চাই। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের মাথামুণ্ডু টাইপের ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এলেন। সারাদেশে রিলিফের মাল বিতরণের জন্য সবাই একাট্টা হলেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করলেন শেরে বাংলা। তার পাশে অন্যান্য আসন অলংকৃত করলেন বিল্লিয়ে বাংলা, কুত্তায়ে বাংলা, শিয়ালে বাংলা, ছাগলে বাংলা, গাধায়ে বাংলা, হাতিয়ে বাংলা, টাট্টুয়ে বাংলাসহ আরো অনেকে। একমাত্র মানুষে বাংলা সেই কনফারেন্সে অনুপস্থিত ছিল। ফলে কনফারেন্সের সর্বশেষ স্লোগান হলো– জানোয়ারে বাংলা জিন্দাবাদ, মানুষে বাংলা মুর্দাবাদ। ❑

---

৩৮. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার- ২৬ পৃ.।
৩৯. সূরা আল বাক্বারাহ : ২৮৬।
৪০. সহীহুল বুখারী- হা. ২৪০৭।

পাপের শাস্তি অনিবার্য

–মো. আবু তালেব হীরা বিন মুনসুর আলী*

এক সময় ইরাকের মুসেলে এক সৎ ব্যক্তি বাস করতেন। তার নাম ছিল 'আলী ইবনু হারব। তিনি বলেন, আমি নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ক্রয় করার জন্য মুসেল থেকে সুররামান রায়া নামক স্থানে যাচ্ছিলাম। সে সময় দাজলা নদীতে কিছু নৌকা ছিল। যেগুলো ভাড়ায় লোকজন ও মালামাল পারাপার করত। আমি একটি নৌকায় আরোহণ করলাম।

তারপর নৌকা আমাদেরকে নিয়ে সুররামান রায়ার দিকে চলতে শুরু করল। নৌকায় মালামাল ব্যতীত আমরা পাঁচজন যাত্রী ছিলাম। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। আকাশ খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। দাজলা নদীও ছিল শান্ত। নৌকা তরতর করে বয়ে চলছিল। যাত্রীদের অধিকাংশই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। আমি দাজলা নদীর উভয় তীরের সৌন্দর্য অবলকন করছিলাম। হঠাৎ পানি থেকে একটি বড়ো মাছ লাফিয়ে নৌকায় এসে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে মাছটি ধরে ফেললাম।

বিশালকায় মাছের লেজের ঝাপটানিতে লোকদের তন্দ্রা দূর হয়ে গেল। মাছ দেখতে পেয়ে তাদের একজন বলল, এই মাছ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা সামনে কোনো তীরে নেমে মাছটি ভুনা করে খাব। সকলে একমত হওয়ায় তীরের দিকে নৌকা ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। আমরা তীরে অবতরণ করে ঘন গাছ বিশিষ্ট এক স্থানে অবস্থান করলাম, যাতে জ্বালানী জমা করে মাছটি রান্না করা যায়।

আমরা সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। একটি মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, পাশেই পড়ে আছে একটি ধারালো চাকু। অদূরে অন্য এক যুবক হাত-পা এবং মুখে কাপড় বাঁধা। সে বাঁধন মুক্ত হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। আমরা দ্রুত সামনে ঐ লোকটির সকল বাঁধন খুলে দিলাম। তার চেহারায় অত্যন্ত ভীতি ও নিরাশার ছাপ ছিল। বাঁধন মুক্ত হয়ে সে বলল, দয়া করে আমাকে একটু পানি দিন। আমরা তাকে পানি দিলাম।

এরপর আমাদেরকে সে পূর্ণ ঘটনা শুনাল। সে বলল, আমি ও এ মৃত ব্যক্তি একই কাফেলায় ছিলাম। আমরা মুসেল থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছিলাম। এ নিহত ব্যক্তি ভাবল যে, আমার নিকট অনেক অর্থ আছে। তাই সে আমার সাথে আন্তরিকতা গড়ে তোলে এবং আমার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়। আমারও তার উপর যথেষ্ট ভরসা ছিল। কাফেলা বাগদাদ যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এ তীরে তাঁবু ফেলল।

রাতের শেষ ভাগে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে থাকায় কাফেলা রাওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পারিনি। আমার ঘুমের মধ্যে নিহত ব্যক্তি আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। মুখও কাপড় দিয়ে বেধে দেয়, যাতে আমি চিৎকার করতে না পারি। এরপর সে আমাকে হত্যা করার জন্য মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর বসে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন আমি বললাম, ওহে! তুমি আমার সকল সম্পদ নিয়ে নাও, তবুও আমাকে প্রাণে মের না। সে এতে রাযি হলো না; বরং তার বেল্টের সাথে বেঁধে রাখা ধারালো চাকু বের কারার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সহজে চাকুটি বের করতে পারল না। ফলে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চাকু বের করতে গেল। এতে চাকু তার নিজ গলায় বিদ্ধ হয়ে শাহরগ কেটে গেল। তার প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এ পাপিষ্ট আমার চোখের সামনে তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেল। আমি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা যেখানে আছি, কম লোকই এই পথ দিয়ে যায়। ফলে বাঁধনমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। অবশেষে আমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট কাউকে পাঠিয়ে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমি সর্বদা এ দু'আই করেছিলাম। এ কারণেই হয়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

[আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বাক্য আছে– "রাখে আল্লাহ মারে কে, আর মারে আল্লাহ রাখে কে?"]

বলতো, তোমরা কি কারণে এ জনমানবহীন স্থানে আসতে বাধ্য হয়েছ? কাফেলার লোকেরা বলল, একটা মাছ আমাদেরকে তোমার নিকট আসতে বাধ্য করেছে। যেটা পানি থেকে আমাদের নৌকায় লাফিয়ে উঠেছিল। আমরা এই মাছ ভুনা করে খাওয়ার জন্য এখানে এসেছি। কাফেলার লোকদের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মাছটি তোমাদের নৌকায় পাঠিয়েছিলেন আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। এরই মধ্যে মাছটি নৌকা হতে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবার ধারণা হলো যে, আল্লাহ মাছকে ঐ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যই পাঠিয়েছিলেন।

এভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা কিছু করতে চান, তখন তার জন্য কারণ সৃষ্টি করে দেন[৪১]। নবী কারিম (ﷺ) মু'আয ইবনু জাবালকে বলেছিলেন, 'মাযলুমের বদদু'আ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মাযলুমের দু'আ এবং মহান আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকে না'।[৪২] ❑

---

* *আলিম, তামীরুল মিল্লাহ কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।*

[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৭৩।*

[৪২] *বুখারী- ২৪৪৮; মুসলিম- ১৯; তারীখু দিমাশ্‌ক- ইবনু আসাকির, ২৬/৩৮৫; ত্বাবাকাতুল আওলিয়া- ইবনু মুল্লাকান, ১/১৮০।*

বিপদের বন্ধু তৈরি করুন

–মো. খাশিউর রহমান বিন মুনসুর আলী*

সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, অনাকঙ্খিত জিনিসটি তত ঘনিয়ে আসছে। না চাইলেও সবার জীবনে আসবেই একবার। যার থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। যার সাথে আলিঙ্গন করতে হবে প্রত্যেকটি প্রাণীকেই। তবুও যেন সেই জিনিসটিকে স্মরণে রেখে কাজ করতে আমরা যথেষ্ট উদাসীন। একটু আপনার নযর বুলিয়ে দেখুনতো, যারা ইতিপূর্বে ছিল তারা আজ কেউ বেঁচে আছে কী? যারা ইতিপূর্বে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল তারা কী কেউ কোনো রাজ্যক্ষমতা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছে? যাদের পদাঙ্কের পদে পদে গ্রাম ও শহরের মানুষেরা কম্পিত হতো, তারা কি তাদের ক্ষমতার দাপট নিয়ে যেতে পেরেছে? তাহলে আজকে যারা আছে, আপনার কি মনে হয়, তারা কি কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? না তারা সারা জীবন বেঁচে থাকবে? না তারা আপনাকে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে পারবে? না... কখনই না। তাহলে আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন কার সাথে আপনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলছেন; বরং আপনি এমন কারো সাথে বন্ধুত্ব করছেন যাদের সবাইকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু'র স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে! আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যারা আপনার শৈশবকালের বন্ধু ছিল তারা আজ আপনার সাথে নেই! যারা আপনার ক্লাসমেট ছিল, যাদের সাথে আপনার প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতিবাহিত হতো আনন্দ প্রমোদে তারা আজ সবাই নিজ নিজ কর্মে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউবা নিজ পরিবার নিয়ে, কেউবা নিজ চাকরি নিয়ে, কেউবা আপন প্রতিষ্ঠান নিয়ে, কেউবা আপন পড়ালেখা নিয়ে! তারা কি আপনাকে একটু স্মরণ করে? এ কথাটি স্মরণে রাখবেন "মাটির উপর মাটি দিয়ে মাটি লেখা যতটা সহজ, পানির উপর পানি দিয়ে পানি লেখার চাইতেও কঠিন, মানুষের সাথে নিজের বন্ধুত্ব রক্ষা করা।" তাহলে আপনিই ঠিক করে নিন, আপনি কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন? যে আপনার বিপদের দিনে এগিয়ে আসবে নাকি যে দৌড়ে পালাবে? আমরা এতই হতভাগা এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছি যে, আল্লাহ তা'আলা'র প্রতি আমরা আমাদের বিশ্বাসটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। আমরা 'আমল করতে যেন অনাগ্রহী! অথচ আমাদের সারা জীবনের সম্পূর্ণ সফলতা নির্ভর করে (মহান আল্লাহর হুকুমে/তার দয়ায়) 'আমলের উপর। তাহলে আপনি কি এখনও আসল উপকারী বা বিপদের বন্ধু চয়ন করতে ভুল করবেন? এমনকি অনেকের মনে এমন খারাপ বা নিকৃষ্ট চিন্তা ভাবনার জন্ম নেয় যেমন, 'আমল করেইবা কি হবে? 'আমল দ্বারা কি কিছু করা সম্ভব? যদি 'আমল দ্বারা কিছু করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যু'র আগে করব। যৌবন কালে একটু আনন্দ ফুর্তি করি। যাদের এমন চিন্তা চেতনা, আমি তাদেরকে বলতে চাই। আপনারা সাবধান হয়ে যান, আপনার যৌবনকাল যেন আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়! মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন এমন কোনো বিপদের মুখোমুখি না হয়ে যান (যেখানে কেউ দেখবে না) যাতে একাকী মরতে হয়। আর এমন বিপদে পরলে বুঝতে পারবেন, সৎ 'আমল কত উপকারী বন্ধু। অতএব মহান আল্লাহর জন্য কিছু করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার অনাকঙ্ক্ষিত অনেক কিছু দিবেন, যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি। আমার এগুলো দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করার কারণ হলো আমি নিজেই তা পেয়েছি, আমার মাদ্‌রাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ'র শিক্ষাকালীন জীবনে। তাই নিম্নের হাদীসটি পাঠ করে শিক্ষা নিন।

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফার সন্তান 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমাদের পূর্বের যুগের লোকদের মাঝে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মাঝে পড়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিলো। আশ্রয় নেওয়ার সাথেই তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল।

তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! মহান আল্লাহর শপথ! এখন সত্য মাধ্যম ব্যতীত আর কিছু তোমাদের রেহাই দিতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিস দিয়ে দু'আ করা প্রয়োজন, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সত্যতা বহাল আছে।

তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি তো ভালো করেই জানেন যে, আমার একজন চাকর ছিল। সে ফারাক চালের বদলে আমার কাজ করে দিয়েছিল। কিন্তু পরে সে আমার নিকট হতে

* *সানা : সানি, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, রাজশাহী; সাবেক সেক্রেটারি, মাদ্‌রাসাতুল হুদা, শুব্বান শাখা, ঠাকুরগাঁও।*

মজুরি না নিয়েই প্রস্থান করেছিল। তাই আমি তার সম্পদ দিয়ে কিছু একটা করার ইচ্ছা করলাম এবং তা আমার কৃষি কাজে লাগালাম। ফলে যা উপার্জন হলো তা দিয়ে একটি গাভী ক্রয় করলাম। অনেকদিন পর সে মজুরদার আমার নিকট আগমন করে তার মজুরি দাবি করল। তখন আমি তাকে বললাম, এই গাভীগুলোর দিকে তাকাও এবং তা তাড়িয়ে নিয়ে যাও। সে জবাবে বলল, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার নিকট মাত্র এক ফারাক শস্য পাওনা। আমি তাকে বললাম, গাভীগুলো নিয়ে যাও। কারণ, (তোমার) সেই ফারাক দিয়ে যা উৎপাদিত হয়েছিল, তারই বদলে এটি ক্রয় করা হয়েছে। তখন সে গাভীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

(হে আল্লাহ!) যদি আপনি মনে করেন তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এই পাথরটি) সরিয়ে দিন। অতঃপর পাথরটি কিছুটা সরে গেল।

দ্বিতীয় লোকটি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি তো ভালো করে জানেন যে, আমার বাবা-মা খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রত্যেক রাত্রে তাদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাত্রে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি বিলম্ব করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, তখন তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার পিতা মাতাকে দুধ পান না করানো পর্যন্ত আমার (ক্ষুধায় কাতর) ছেলে মেয়েদের দুধ পান করাইনি। কারণ তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটা আমি ভালো মনে করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভালো লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তারা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) সকাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের জাগার অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি আপনি জেনে থাকেন যে, আমি এটা করেছি একমাত্র আপনার ভয়ে, তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। অতঃপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আকাশ দেখতে পেল।

সর্বশেষ তৃতীয় ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন যে, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সবার চাইতে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে (যৌন মিলনের) ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশত দিনার না দেওয়ার পর্যন্ত সে রাজি হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে সক্ষম হলাম। অতঃপর তা নিয়ে তার নিকট আগমন করলাম এবং এই একশত দিনার দিয়ে দিলাম। তখন সে নিজেই নিজেকে আমার নিকট সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং (শরিয়তের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ছাড়া আমার সতীত্বকে নষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিলাম এবং একশত দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। আপনি যদি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করেছি, তাহলে আপনি আমাদের হতে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হতে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা বেরিয়ে আসল।

কাহিনি থেকে নিজের মাঝে রূপান্তরিত বিষয়সমূহ

১. মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলার কাছেই কল্যাণ, অকল্যাণ করার চাবি-কাঠি। (মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই গুহার মুখ বন্ধ হয়েছিল এবং তারই ইচ্ছাতেই গুহার মুখ দ্বারমুক্ত হয়েছিল)

২. বিপদে প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ করা এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা।

৩. সৎ 'আমলের ওসিলায় দু'আ করা।

৪. অন্যের হক্ব নষ্ট না করা। এমনকি কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মালিক দীর্ঘদিন পর এসে দাবি করলেও তা ফেরত দেওয়া।[৪৩]

৫. মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা। কোনোভাবেই যেন কষ্টের শিকার না হয়। তাদের উভয়কে উফ্ কথাটিও বলবেন না।[৪৪]

৬. মহান আল্লাহর ভয় অন্তরে লালন করা।

৭. মহান আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি কখনো যিনার ধারেও যেতে পারে না।

৮. সৎ 'আমল, বিপদ হতে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম।

৯. বিপদে আপতিত হলে প্রথমে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া।

১০. লাবণ্যময়ী রূপ দেখে কারো দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অতিব জরুরি।

অতএব, আসুন বিপদে আপনার ও আমার উপকারে আগমন করবে এমন বন্ধু চয়নে সচেষ্ট হয়ে আলোকিত করি দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে এবং এই মহা মূল্যবান মাস রামাযানকে কাজে লাগিয়ে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, যিক্র-আযকার, দান- সাদাক্বাহ্, ক্ষমা প্রার্থনা করে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে নিজের স্থান জান্নাতে করে নেই, আল্লাহ আমাদের কবুল করুন –আমীন। ❑

---

[৪৩] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৪৪] *সূরা বানী ইসরাঈল : ২৩।*

আবূ যার্ গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন কথা

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী*

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গিফারী গোত্রের লোক ছিলেন। মক্কা ও মদীনার মাঝখানের একটি স্থানে গিফার গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। সেকালে মক্কা হতে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো গিফার গোত্রের লোকদের পাশ দিয়েই অতিক্রম করত। ডাকাতি ও ছিনতাইকারী হিসাবে এই গোত্রটি প্রসিদ্ধতা অর্জন করেছিল। গিফার গোত্রের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক। কিন্তু আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মূর্তিপূজা মোটেই পছন্দ করতেন না। সেই সাথে তিনি এমন একজন নতুন নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন, যিনি হেদায়াতের আলো দিয়ে পৃথিবীবাসীর বিবেক ও হৃদয়কে ভরে দিবেন এবং অন্ধকার থেকে তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।

এমন সময় আবূ যারের কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন যে, আকাশ থেকে তাঁর কাছে ওহী আগমন করে থাকে। এমনি আরও কিছু খবর আবূ যারের কাছে পৌঁছল।

তাই আবূ যার খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং নতুন নবীর অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তার ভাই উনাইসকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। উনাইস মক্কায় গিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দেখা করল। সে তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নিজ গ্রামে ফেরত আসল।

ঐ দিকে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রচুর আগ্রহ নিয়ে ভাইয়ের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই তিনি ভাইকে নতুন নবীর খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ভাই উনাইস তাঁকে বলল, তিনি (নতুন নবী) মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করেন। এ রকম আরও কিছু কথা বলল। সে আরও বলল, আল্লাহর শপথ! তিনি এমন কথা বলেন, যা কোনো কাব্য নয়। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কি বলে? উনাইস বলল, লোকেরা তাকে যাদুকর, গণক এবং কবি বলে।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, তোমার কথায় আমার পিপাসা মিটেনি এবং আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তাও পূর্ণ হয়নি। তুমি কি আমার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করবে? যাতে আমি নিজেই মক্কায় গিয়ে তাঁর খবরাখবর নিতে পারি? উনাইস বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি তা করব। তবে আপনি সতর্কতার সাথে মক্কায় প্রবেশ করবেন।

পরের দিন সকালে তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দেখা করার জন্য মক্কার পথে রওয়ানা দিলেন। প্রয়োজনীয় সফরসামগ্রী এবং ছোট একটি মশক ভর্তি পানি সাথে নিলেন।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কাবাসীদের ভয়ে চুপচাপ তথায় প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখলেন, মূর্তিপূজক কুরাইশরা খুবই রাগান্বিত এবং যেই মুহাম্মাদের অনুসরণ করার ইচ্ছা করে, তার উপরই তারা ঝাপিয়ে পড়ে। তাই তিনি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। কেননা তিনি জানতেন না যে, যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষের লোক? না তাঁর শত্রুপক্ষের লোক?

এমতাবস্থায় যখন রাত হয়ে গেল, তখন তিনি মসজিদে শুয়ে পড়লেন। এ সময় 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তি একজন অপরিচিত এবং বহিরাগত লোক।

তিনি বললেন, হে লোক! আমার সাথে চলো। তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে চললেন এবং তাঁর কাছেই রাত্রি যাপন করলেন। সকাল হলেই তার সফরসামগ্রী ও পানির মশকটি সাথে নিয়ে মসজিদে চলে আসলেন। কাউকেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না।

এভাবেই আবূ যার্ দুই দিন পার করলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এখনও পরিচিত হতে পারেননি। বিকাল হলে তিনি আগের রাতের মতোই মসজিদে শুয়ে পড়লেন। এবারও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এই লোকটি কি এখনও তার ঠিকানা খুঁজে পায়নি?

অতঃপর আবূ যার্ দ্বিতীয় রাতও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছেই কাটালেন। তিনি কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি এবং তাকে কিংবা 'আলীকেও তার সম্পর্কে কেউ কিছুই জানতে চেষ্টা করেনি।

রাতে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, তুমি কি জন্য মক্কায় এসেছ? দয়া করে বলবে কি? তিনি বললেন, আপনি যদি আমার সাথে ওয়াদা করেন যে, আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তার সন্ধান দিবেন, তাহলে আপনার কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করব। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন।

এবার আবূ যার্ বললেন, আমি বহুদূর থেকে মক্কায় এসেছি। কারণ আমি নতুন একজন নবীর আগমনের কথা

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।*

শুনেছি। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই এবং তার জবান থেকে কিছু কথা শুনতে আগ্রহী।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল! অতঃপর তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আরও কিছু কথা বললেন।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও বললেন, সকাল হলে তুমি আমার পিছে পিছে চলবে। আমি যেখানে যাব, তুমিও সেখানে যাবে। আমি যদি তোমার জন্য বিপদজনক কিছু দেখি, তাহলে আমি দাঁড়িয়ে যাব এবং এমন ভঙ্গি করব, যাতে মনে হবে আমি পেশাব করছি। পুনরায় আমি যখন চলতে শুরু করব, তখন তুমিও আমার সাথে চলবে। আমি যেখানে প্রবেশ করব, তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে।

এই রাতে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কোন ঘুম হয়নি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখার এবং তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কিছু অহীর বাণী শুনবেন- এই আশায় ও অধির আগ্রহে তিনি বিনিদ্র রজনী পার করলেন।

সকাল হলে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মেহমান নিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরের দিকে চললেন। আবূ যার তার পিছনে চললেন। তিনি এদিক ওদিক কোন কিছুর প্রতিই তাকাচ্ছেন না। পরিশেষে তারা উভয়েই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র দরবারে গিয়ে বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

وَعَلَيْكَ سَلَام اللهِ ورحمته وبركاته.

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ই সর্বপ্রথম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইসলামের এই সালাম প্রদান করেন। এরপর এটি মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপকতা লাভ করে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবার আবূ যারের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন ও কুরআন পাঠ করে শুনালেন। পরক্ষণেই তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করেন। বলা হয় যে, এ সময় পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি চার দিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলাম শিখালেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরাও শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি বললেন, মক্কার কাউকেই তোমার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনাবে না। আমার আশঙ্কা, তারা যদি তোমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তখন বললাম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সেই সত্তার শপথ! মসজিদে গিয়ে কুরাইশদের সামনে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার পূর্বে মক্কা ত্যাগ করব না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এই দৃঢ়তার কথা শুনলেন। কিন্তু তার ইচ্ছার প্রতিবাদ না করে সম্পূর্ণ নিরব রইলেন।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। কুরাইশরা তখন মসজিদে বসে গল্প করছিল। আমি তাদের ঠিক মাঝখানে গেলাম। আমি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! শুনো!

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সঠিক কোনো উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

আমার এই কথা তাদের কর্ণে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তারা আতঙ্কিত হলো এবং মজলিস থেকে সকলেই উঠে দাঁড়াল। তারা এক বাক্যে বলে উঠল, এই বেদ্বীনকে পাকড়াও করো। সকলেই আমার দিকে চলে এসে আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। প্রহারের প্রচণ্ডতার কারণে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। তখন 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব এসে আমাকে উদ্ধার করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার গিফার গোত্রের একজন লোককে হত্য করেত যাচ্ছ? ধ্বংস হোক তোমাদের। তাদের কাছ দিয়ে যাতায়াতকারী তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার কি অবস্থা হবে? তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? 'আব্বাসের এই কথা শুনে তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। আমার হুঁশ ফেরত আসলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, আমি কি তোমাকে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে নিষেধ করিনি?

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটিই আমার মনোবাসনা ছিল। আমি তা পূর্ণ করেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবার তাকে বললেন, তুমি তোমার দেশে চলে যাও। তুমি এখানে যা দেখলে এবং যা শুনলে, তা তোমার জাতির লোকদেরকে বলো। তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করো। সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমার মাধ্যমে তাদের উপকার করবেন। তোমার কাছে যখন খবর পৌঁছবে যে, আমি জয়লাভ করেছি, তখন তুমি আমার কাছে চলে আসবে।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর আমি আমার গোত্রীয় লোকদের নিকট চলে আসলাম। আমার ভাই উনাইস তখন বলল, আপনার খবর কি? আমি বললাম, আমার অবস্থা এই যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মহান আল্লাহর নবীকে সত্যায়ন করেছি। এ কথা শুনে উনাইসেরও অন্তর খুলে গেল। সে বলল, আমিও আপনার দ্বীনের প্রতি খুবই

আগ্রহী। আমি ইসলাম কবুল করে নিলাম এবং আল্লাহর রাসূলকে সত্যায়ন করলাম।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর আমরা উভয়েই আমাদের মা-এর কাছে গেলাম। তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দীন গ্রহণ করলাম।

সেই দিন হতেই এই মু'মিন পরিবার গিফার গোত্রে মহান আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করল। তাদের নিরলস পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে গেফার গোত্রের প্রচুর লোক ইসলাম গ্রহণ করল। এরই মধ্যে তারা জামা'আতে নামায আদায় শুরু করলেন।

গিফার গোত্রের একদল লোক বলল : আমরা আমাদের দ্বীনেই থেকে যাব। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় হিজরত করবেন, তখন আমরা মুসলমান হব। তারা তাই করল। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন, তারা মুসলমান হয়ে গেল।

বদর, উহুদ এবং খন্দক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আবূ যার্ তাঁর গ্রামেই অবস্থান করেছেন। অতঃপর তিনি মদীনায় চলে আসলেন এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুহবতে থাকাকেই পছন্দ করলেন। তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতের অনুমতি চাইলে তিনি সম্মতি দিলেন। তিনি তাঁর খেদমত করে সৌভাগ্যবান হলেন এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়াতলে দিনাতিপাত করতে থাকলেন। যখনই তাঁর সাথে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেখা হত, তখনই তিনি তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন এবং তাঁর সাক্ষাতে তিনি খুশী হতেন।

আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারীতে আবূ যার্ হতে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে–

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমার প্রভুর পক্ষ হতে একজন আগমনকারী আমার কাছে এসে আমাকে খবর দিয়েছে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে সুসংবাদ দিয়েছে যে, আমার উম্মতের কোনো লোক আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যার বলেন, আমি বললাম- যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে? তিনি বললেন, যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো প্রকার কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম- কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক ও মনিবের নিকট অধিক প্রিয়। আবূ যার বলেন, আমি বললাম : যদি আমি এরূপ করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে তুমি কোনো কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা অদক্ষ লোককে কোনো কর্ম শিক্ষা দিবে। আমি আবার বললাম : আমি যদি এ কাজও করতে না পারি? তিনি বললেন, মানব সমাজকে তোমার ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে। কেননা এটাও সাদাক্বাহ্ যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পার।

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পছন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় পরিণত করা হোক এবং তা থেকে তিন দিনের বেশি আমার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকুক। তবে সেই দীনার ব্যতীত যা দ্বারা আমি ঋণ পরিশোধ করব। তারপর তিনি বললেন, যারা বেশি সম্পদশালী তারাই কম সাওয়াব পেয়ে থাকে। তবে তারা ব্যতীত যারা এভাবে এভাবে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এরকম লোক খুবই কম। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি ফেরত না আসা পর্যন্ত তুমি নিজ স্থানে অবস্থান করো। এই বলে তিনি কিছু দূর অগ্রসর হলেন। এ সময় আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সে দিকে যেতে চাইলাম। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা মনে পড়ে গেল, "আমি ফেরত না আসা পর্যন্ত তুমি নিজ স্থানে অবস্থান করো"। তিনি যখন আসলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটি কিসের আওয়াজ শুনলাম? তিনি বললেন, তুমি শুনেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আগমন করে বললেন, আপনার উম্মতের যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে এরকম এরকম (গুনাহ) করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবুও।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথ চলছিলেন। কোনো কোনো সাহাবী তাঁর পিছনে রয়ে গেল। লোকেরা তখন বলতঃ উমুক পিছনে রয়ে গেছে। বলা হলো– আবূ যারও পিছনে রয়ে গেছে। তিনি যুদ্ধে বের হননি। তিনি তখন বলতেন : তাকে ছাড়ো, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর অন্য কিছু থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিবেন।

আসল কথা হলো আবূ যার্ গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উট খুব ধীর গতিতে চলছিল। যার কারণে তিনি সাথীদের সাথে চলতে পারেননি। তাই তিনি উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের পিঠে বহন করতে লাগলেন এবং একাকীই তাবুকের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এটিই ছিল তার পিছনে পড়ার একমাত্র কারণ। রাস্তার কোনো এক স্থানে যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবতরণ করলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দেখুন! একজন লোক রাস্তায় একা চলছে এবং আমাদের দিকেই আগমন করছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐ লোকটি আবূ যার্ ছাড়া আর কে হবে? তারা

গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে চিনে ফেলল এবং বলল– হে আল্লাহর রাসূল! এ তো দেখছি আসলেই আবূ যার্। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ যারের উপর রহম করুন! সে একাকীই চলবে, একাকীই মৃত্যু বরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন একাই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে।[৪৫]

সহীহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে, আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর যখন মৃত্যুর সময় হলো, তখন তাঁর স্ত্রী খুব কাঁদছিলেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী বললেন, আমি কাঁদব না? আপনি একটি নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করছেন! আর আমার কাছে এমন কোন কাপড় নেই, যা আপনার কাফনের জন্য যথেষ্ট হবে। আপনাকে দাফন করার মতো শক্তিও আমার নেই এবং সহযোগিতা করার মতো কোনো লোকও এখানে নেই। আবূ যার্ তখন বললেন, তুমি কেঁদো না। কেননা আমি রাসূল (ﷺ)-কে এমন একদল লোককে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে একজন লোক নির্জন ভূমিতে ইন্তেকাল করবে। তথাপি তার জানাযার নামাযে মুসলিমদের একটি জামা'আত শরীক হবে। আবূ যার্ বলেন, ঐ দলের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের কেউ এখন জীবিত নেই। একমাত্র আমিই জীবিত আছি। সুতরাং নির্জন ভূমিতে একাকী মৃত্যু বরণকারী আমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভুল বলছি না, আমার কথা মিথ্যাও নয়। তুমি রাস্তার দিকে খেয়াল রাখ। দেখো! কোনো মানুষ দেখা যায় কি না। তাঁর স্ত্রী উম্মে যার্ বললেন, হজ্জের মৌসুম শেষ। হাজীগণ চলে গেছেন, রাস্তা খালী হয়ে গেছে। সুতরাং লোকের সন্ধান পাব কোথায়? আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় বললেন, যাও এবং খুঁজে দেখো। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ধু-ধু মরুভূমির উপর গভীর দৃষ্টি দিতাম, কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। কোনো বানী আদমের আভাস না পেয়ে আমি আবূ যারের কাছে ফেরত আসতাম এবং তার সেবায় মশগুল হতাম। আমার এবং আবূ যারের সময় এভাবেই পার হতে থাকল। হঠাৎ দেখলাম : কিছু লোক তাদের বাহনসমূহে আরোহণ করে পথ চলছে। তাদের বাহনগুলো তাদেরকে নিয়ে কদমতালে চলছে। উম্মে যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাদের দিকে ইঙ্গিত করতেই তারা আমার দিকে দ্রুত চলে আসলো এবং আমার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তারা বলল : হে আল্লাহর বান্দী! তোমার এই দশা কেন? আমি বললাম একজন মুসলিম মৃত্যুর পথে যাত্রা করছে। দয়া করে তার কাফন ও দাফনের কাজে সহায়তা করবেন কি? তারা জিজ্ঞেস করলেন কে সেই ব্যক্তি? উম্মে যার্ বলেন, আমি বললাম : তিনি হচ্ছেন আবূ যার্। অশ্বারোহীগণ বললেন, আল্লাহর রাসূলের সাথী আবূ যার্? উম্মে যার্ বলেন আমি বললাম : হ্যাঁ, রাসূল (ﷺ)-এর সাথী আবূ যার্। তারা বললেন, আবূ যারের জন্য আমাদের মা-বাপ কুরবান হোক! অতঃপর তারা দ্রুত তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। আবূ যার্ তখন বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো! আমি রাসূল (ﷺ)-কে এমন একদল লোককে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে হতে একজন লোক নির্জন ভূমিতে ইন্তেকাল করবে। তথাপি তার জানাযার নামাযে মুসলিমদের একটি জামা'আত শরীক হবে। ঐ দলের সকলেই মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কেউ এখন জীবিত নেই। একমাত্র আমিই জীবিত আছি। সুতরাং নির্জন ভূমিতে একাকী মৃত্যু বরণকারী আমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভুল বলছি না, আমার কথা মিথ্যাও নয়। আমার কাছে যদি এমন একটি কাপড় থাকত, যা আমার কাফনের জন্য যথেষ্ট কিংবা আমার স্ত্রীর কাছেও যদি আমাকে কাফন দেয়ার মতো কোনো কাপড় থাকত, তাহলে আমার অথবা আমার স্ত্রীর কাপড় ব্যতীত অন্য কোনো কাপড়ে কাফন দেয়া হত না। আমি তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করছি যে, তোমাদের মধ্যে হতে ঐ ব্যক্তি যেন আমার কাফন না দেয়, যে কোনো অঞ্চলের আমীর ছিল অথবা গভর্নর ছিল অথবা বিচারক ছিল অথবা অন্য কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করেছিল। তারা সকলেই চিন্তা করে দেখল, এই অশ্বারোহী দলের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যে উপরোক্ত কোনো না কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়নি। আনসারদের একজন কম বয়সি যুবকই আবূ যারের মূল্যায়নে টিকে ছিল। কারণ সে কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করেনি। সে বলল, হে চাচা! আমি আপনাকে আমার এই চাদরে এবং সেই দু'টি কাপড়ে কাফন পরাব, যা আমার মা বুনিয়েছেন। কাপড় দু'টি আমার এই থলেতে রয়েছে। আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তুমিই আমাকে কাফন পড়াবে। কিছুক্ষণ পর আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে মৃত্যুবরণ করলেন। সেই আনসারী যুবকই কাফন পরিধান করাল। তখন সকলে মিলে তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করলেন। এই লোকদের সকলেই ছিল ইয়ামানের অধিবাসী।[৪৬]

হিজরী ৩২ সালে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে তিনি রাবযাহ্ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মদীনা মুনাওয়ারা হতে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ যাওয়ার পথে আজও সেই স্থানটি রাবযাহ্ নামেই পরিচিত। রাস্তার ডান পাশেই তাঁর কবর রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ❑

[৪৫] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৪/১৪।*

[৪৬] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ২২৬০, সনদ হাসান।*

ক্বাসাসুল হাদীস

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর বিচক্ষণতা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে সুলায়মান অন্যতম। দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) আনু. ১৯৯২ খ্রি. পূর্বাব্দে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন[৪৭]। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা শৈশবেই প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে–

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ও সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন মহিলা একই সাথে কোথাও যাচ্ছিলো। তাদের উভয়ের সাথেই একটি করে শিশুপুত্র ছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ করে একটি নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেলো। এখন তাদের কাছে যে বাচ্চাটি ছিলো তা নিয়ে তারা উভয়েই ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। একজন বললো, এটা আমার বাচ্চা তোমার নয়। তাদের কেউই বাচ্চাটির দাবি ছাড়তে প্রস্তুত নয়। উভয়েই বাচ্চাটিকে তার নিজের বাচ্চা বলে দাবিতে অটল রইলো।

সময়টা ছিল দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নবুওয়াতকাল। মানুষ নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর শরনাপন্ন হতো। অতএব এ দু মহিলার ব্যাপারটাও দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর দরবারে প্রেরিত হলো। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) উভয়ের দাবি শুনলেন এবং যথাসাধ্য চিন্তা ভাবনার পর রায় ঘোষণা করলেন যে, বয়সের দিক থেকে বড়ো বাচ্চাটি তার। (ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি এ সিদ্ধান্তের কারণে এটাই উল্লেখ করেছেন যে, বাচ্চাটি তখন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার কাছেই ছিল। তাছাড়া বয়োকনিষ্ঠার কাছে এমন কোনো দলিল প্রমাণ ছিল না। যারা বাচ্চাটি তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়।)

রায় ঘোষিত হওয়ার পর উভয় মহিলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর দরবার থেকে বের হলো। তারা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর কিশোর পুত্র সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো।

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার পিতা তোমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দিলেন?

তারা ঘটনাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো।

তিনি বললেন, "আমার পিতা নিজের চিন্তা গবেষণার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

এসো আমি এ ব্যাপারে তার চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত করে দিচ্ছি। এ কথা বলে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) বাচ্চাটিকে নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং একজনকে নির্দেশ দিলেন যে, একটি তরবারী নিয়ে এসো আমি এ বাচ্চাটিকে দু' টুকরো করে দু'জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। একথা শোনার পর বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাটি চুপচাপ থাকলো; কিন্তু বয়োকনিষ্ঠা মহিলাটির পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যেতে থাকলো। কারণ বাচ্চাটি আসলে তারই ছিল।

সে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বাচ্চাটিকে কেটে দু'টুকরা করে দেবেন?

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) বললেন হ্যাঁ। কেননা আমার কাছে এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।

আর তখনই মহিলাটি বলে উঠলো "আপনি এমন করবেন না, আমি আমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছি আমার অর্ধেক তাকেই দিয়ে দিচ্ছি।"

বয়সে ছোট মহিলাটির কথা শুনে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে মূল বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

তিনি সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন যে, বাচ্চাটি বয়সে ছোট মহিলাটির বড়োজনের নয়। অতএব বাচ্চাটিকে ছোট মহিলাটিকে দিয়ে দেয়া হোক। এ সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে গেলো। বাচ্চাটিকে ছোট মহিলাকে দিয়ে দেয়া হলো।[৪৮] ❑

---

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৪৭] *আম্বিয়া-ই কুরআন- ৩/৯৪।*

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭২০।*

বিশেষ মাসায়িল

রামাযানের ফর্‌য সিয়ামের পর নির্ধারিত নফল সিয়ামসমূহ কী কী?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : রামাযান বিদায় নিচ্ছে। আমরা কেউই জানি না আমাদের কার ভাগ্যে আবার একটা রামাযান ফিরে আসবে। অথচ সিয়াম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের নিকট একটি অতি প্রিয় 'ইবাদত। সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কারের ঘোষণা। আর তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নফল সিয়াম পালন করতেন। আবার বন্ধও রেখেছেন।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো এতো বেশি রোযা রাখতেন যে, আমরা ভাবতাম তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনো এমনভাবে ভাঙতেন যে আমরা মনে করতাম তিনি আর রোযা রাখবেন না।" সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে মহান আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখ দোযখের আগুন হতে সত্তর বছরের দূরের পথে রাখেন।" রামাযানের পরই তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ নফল সিয়াম হিসেবে যেসব সিয়াম পালন করতেন উত্তম 'ইবাদতের অংশ হিসাবে তার কয়েকটি আমরা আলোচনা করতে পারি।

আরাফাহ্ ও আশুরার সিয়াম

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, হাদীস "নবী করিম (ﷺ)-কে আরাফাহর রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আরাফাহর দিনের রোযা বিগত এক বছর এবং আগামী বছরের গুনাহের কাফফারাহ হবে। তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আর আশুরার রোযা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে।" শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ সুনান আন্ নাসায়ী, জামে' আত্ তিরমিযী ও সুনান ইবনু মাজাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সহীহ আত্ তাগরীব ও আবূ ইয়ালায় বর্ণিত এবং শাইখ আলবানী কর্তৃক সহীহ হিসেবে স্বীকৃত, "যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে রোযা রাখে তার একাধারে দু'বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে রামাযান মাস ছাড়া অন্যদিনের জন্য রোযা রাখতে এতো অধিক চাপ দিতে দেখি নাই যেমনটি আশুরার দিনে রোযা রাখার চাপ তিনি দিয়েছেন।" তাহলে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় নবী করিম (ﷺ) আশুরার রোযাকে অসম্ভব গুরুত্ব দিতেন।

সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশুরার দিনে রোযা রাখতেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। এটা এমন দিন যাকে ইহুদী ও নাসারাগণ পরম সম্মান করে। আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, নিশ্চয়ই নয় তারিখে আমি রোযা রাখব।" একই গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রামাযান মাসের পরে সর্বোত্তম রোযা মহান আল্লাহর মাস মুহাররমে এবং ফর্‌য সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাতে।" আরও বর্ণিত হয়েছে, "নবী (ﷺ) আশুরার রোযা সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আশুরার রোযা আগামী এক বছরের কাফ্‌ফারা হবে।"

সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ আত্ তারগীব আত্ তারহীবে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে আশুরায় রোযা রাখতেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তবে ইহুদীরা একদিন রোযা রাখে বলে তাদের বিরোধিতা করে নবী করিম (ﷺ)-এর সাথে মিলিয়ে পূর্ব দিন অথবা পরের দিন আর একটি রোযা রাখতেন।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকারীকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন মর্মে সুনান আবূ দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা

য'ঈফ। য'ঈফ ইবনু মাযাতেও হাদীসটি সংকলিত হয়েছে। তবে আরাফার মাঠে নবী করিম (ﷺ) রোযা রাখেননি এমন হাদীস সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিমে উম্মুল ফজল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কতক লোক আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রোযা সম্পর্কে বিবাদ করেছিল। কেউ বলল, তিনি রোযা আছেন। কেউ বলল, তিনি রোযা নেই। আরাফাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাঁর উটে ছিলেন, আমি তার জন্য এক বাটি দুধ পাঠালাম এবং তিনি তা পান করেছিলেন।"

শাওয়াল মাসের ছয় রোযা

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ, জামে' আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্, মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখলো এবং এরপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখলো সে যেন সারা বছরের সিয়াম পালন করলো।" সহীহ সুনান আবূ দাউদে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি (ঈদুল) ফিতরের পর ছয় দিন রোযা রাখলো তাতে এক বছরই পূর্ণ হয়ে গেল। যে একটি নেকী নিয়ে আসে তার জন্য তার দশগুণ রয়েছে।"

প্রতি আরবি মাসের তিন রোযা

সহীহ ইবনু মাজাহ্ ও সহীহ জামে' আত্ তিরমিযীতে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখলো সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করলো। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নাযিল করেন যে একটি নেকী নিয়ে আসে তার জন্য রয়েছে তার দশগুণ। অতএব, এক দিন দশ দিনের সমতুল্য।"

সহীহ সুনান আবূ দাঊদ ও সহীহ সুনান ইবনু মাজায় বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে আইয়্যামে বীযের রোযার ব্যাপারে নসীহত করেছেন, আমরা যেন তা (মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে পালন করি এবং বলেছেন, এটা সারা বছর রোযা রাখার মতোই।" প্রতি মাসে তিনটি রোযা পালনের বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা উত্তম 'ইবাদত বলে গণ্য হয়ে থাকে। আর মাসে তিনটি করে রোযা রাখা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আত্মার শুদ্ধতা, শরীরের যাকাত আর পরকালের পুরস্কার সব মিলে এ ধরনের একটি উত্তম 'ইবাদতের বিষয়ে আমাদের সকলেরই উচিত সচেতন হওয়া।

সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা

নফল রোযার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে সপ্তাহের দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার। সুনান আন্ নাসায়ী, জামে' আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্, ইবনু খুযাইমাহ্ ও মুসনাদে আহমদে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।" সহীহ মুসলিম ও সুনান ইবনু মাজায় বর্ণিত, "একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সোমবার ও বৃহস্পতিবার তাঁর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলিমের গুনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে (আল্লাহ তা'আলা বলেন) এদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে।" জামে' আত্ তিরমিযীতে আরও বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর নিকট বান্দার 'আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় যেন আমার 'আমল পেশ করা হয়।"

এছাড়া নফল রোযা হিসেবে শাবান মাসে নবী করিম (ﷺ) সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। তবে আমাদের উপমহাদেশে পনেরই শাবান শবেবরাতের নামে যে রোযা হয় তা য'ঈফ ও জাল হাদীস নির্ভর। ঐ দিন বিশেষ উদ্দেশ্যে লাইলাতুল মুবারাক মনে করে সিয়াম পালন রীতিমত বিদআত। একইভাবে রজব মাসে সিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ অথবা জাল। অর্থাৎ- এ মাসে বিশেষভাবে সিয়াম পালনের সহীহ সূত্রে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ছোট ছোট নেকী জমিয়ে যেমন নেকীর পাহাড় জমা করা সম্ভব, সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে তার চেয়ে অনেক কম ত্যাগ স্বীকার করে আরও বেশি নেকীর পাহাড় তৈরি করা সম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে উত্তম 'ইবাদত হিসেবে নবী করিম (ﷺ)-এর নির্দেশিত হাদীস অনুসরণের তাওফিক দান করুন –আমিন, সুম্মা আমিন। ❑

সমাজচিন্তা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসব এবং সমাজ চিত্র

–কে এম আব্দুল জলিল*

ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্বে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতম। তিনি মহান আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে দিয়ে বাদশাহ ও ফকির, আমীর ও গরিব, ধনী ও নিধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক, প্রভু ও দাসকে এক সূত্রে গ্রাথিত ও বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই সাম্যে মানুষের অন্তর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছোট-বড়ো, উঁচু-নীচ, ইতর-ভদ্র ও শ্বেত-কৃষ্টের নিকৃষ্ট বন্ধন মুক্ত হয়েছে। প্রতি বছরই দু'বার ঈদের সময় হাজার মুসলমান প্রান্তরে প্রান্তরে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে। মহান আল্লাহর দরবারে মুসলমানগণ যখন কাঁধে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়ায়, তখন একজন দ্বীনহীন কুলির পায়ের কাছেও সম্রাটের মাথা স্থাপিত হতে দেখা যায়। তখন সে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে অনবদ্য ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। সে মনোমুগ্ধকর অপার্থিব দৃশ্য জগতে আর কোথাও মিলবে না। 'ঈদ' আরবি শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে উৎসব, আনন্দ ও খুশি। আরবি সাহিত্যে 'ঈদ' বারবার ফিরে আসার, অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। "Favourite Dictionary" গ্রন্থে ঈদ-উল-ফিতরের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– The festival breaking the 'Ramzan Fast"। তাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক ঈদ, আনন্দ ও উৎসব বার্তা নিয়ে মুসলিম সমাজের সামনে বারবার ফিরে আসে। গরিব-দুঃখী মানুষের ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য 'সাদাক্বাতুল ফিতর' ফর্‌য করেছেন। রাসূলে কারীম (ﷺ) বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) 'সাদাক্বাতুল ফিতর' রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফর্‌য করেছেন।"[৪৯]

দীর্ঘ একটি মাস কঠিন সিয়াম সাধনা, অথচ আনন্দদায়ক। প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে আত্মার তৃপ্তিদায়ক প্রশিক্ষণ শেষে একটু আনন্দ বিনোদনের জন্য আল্লাহ পাক ঈদ-উল-ফিতর দান করেছেন। মুসলমান একে অপরের ভাই, তাই এই আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিত্তশালীদের সাথে বিত্তহীনরা যাতে ঈদের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করতে পারে, তার জন্যই ফিতরা বিত্তহীন তথা গরিব, দুঃখী মানুষের মাঝে বন্টিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে যেমন গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাঁসি ফুটে, তেমনি তারা ধনীদের মতো আনন্দে শরীক হতে পারে। ফলে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি, সৌহার্দ ও ভালোবাসার এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলাম শ্রেণিবৈষম্য ভেঙে চুরমার করে ভেদ কলুষিত অসাম্য দূরীকরণের আহ্বান জানায়। তাই সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

"খালেদের মত সব অসাম্য
ভেঙ্গে করো একাকার
ইসলামে নাই ছোট-বড় আর
আশরাফ আতরাফ।"

অন্যত্র বলেন :

"ক্ষুধায় মরিবে কেহ নিরন্ন
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন
এ জুলুম সহেনিক ইসলাম
সহিবে না আজো আর।"

মুহাম্মদ (ﷺ) জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবজাতিকে এক সমাজভুক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেননি, বাস্তব জগতে কোটি কোটি মানুষেকে এই সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও

* *সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৪৯] *সুনান আবূ দাউদ।*

বিশ্বজনীন ধর্ম। সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত। নিরন্নকে অন্নদান, গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাঁসি ফুটাবে ইসলাম কিন্তু তা কোথায়? রাসূলে কারীম (ﷺ) রামাযান মাসের রোযার ফিতরা এক সা' পরিমাণ খেজুর, এক সা' পরিমাণ যব, এক সা' পরিমাণ কিশমিশ, এক সা' পরিমাণ পনির মুসলমান সমাজের প্রত্যেক স্বাধীন দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকলের উপর আদায় করা ফর্‌য করেছেন।"[৫০]

আল্লাহ তা'আলা যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর এক সা' পরিমাণ ফিতরা আদায় করাকে ফর্‌য করেছেন, অথচ সেখানে নেসাব শব্দ জুড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, যাতে বায়ান্ন তোলা রুপা বা তার সমপরিমাণ টাকা অলংকার অথবা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ টাকা অলংকার বা অনাবশ্যক আসবাবপত্র থাকলে এবং উক্ত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত না হলে তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। মাযহাবী সংকীর্ণতার দোহাই দিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতকে বিদায় করে দেয়া হলো। সাথে সাথে ফকির, মিসকিনের হক্ব নষ্ট করা হলো, বঞ্চিত করা হলো তাদের ঈদের আনন্দ থেকে। ইসলাম যে সাম্য মৈত্রীর অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন ঈদ অনুষ্ঠানের মধ্যে তার বাস্তবতা লক্ষণীয়। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষের এক কাতারে শামিল হওয়ার এ দৃষ্টান্ত মানবতা ও সাম্যের এক অনন্য নিদর্শন। ইসলামের সেই গৌরবময় ও সোনালি যুগে যে ঈদ একদিন মুসলমানদের জীবনে বয়ে এনেছিল সফলতা ও আনন্দের বন্যা। আজ সেই ঈদ আসে শত প্রশ্ন ও বেদনার আহাজারি নিয়ে। আরো বাড়িয়ে দেয় গরিব-দুঃখী মানুষের হাহাকার, বেদনা, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা। ঈদের আগমনে বৃদ্ধি পায় গরিব-দুঃখী মানুষের করুন আর্তনাদ। সমাজের অসহায় মানুষগুলো মনে করে ঈদ অর্থ বাড়তি ঝামেলা। বস্তুত সমাজের অসংখ্য বাবা-মাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। তাদের অবুঝ ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন মিটাতে না পারায় কেঁদে গড়াগড়ি খায় মাটিতে, আর দুর্বিষহ করে তোলে তাদের জীবন। ঈদের এই দিন কি ইসলামের সেই স্বর্ণযুগের মতো হয়ে ফিরে আসতে পারে না? যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, কোনো বৈষম্য কিংবা উঁচু-নীচু, শ্রেণি বিন্যাস। আমরা কি পারি না ইসলামের সেই চিরন্তন শাশ্বত বিধান তথা ধনীদের সম্পদে গরিব-দুঃখী মানুষের সঠিক হক্ব আদায় করে তাদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করতে? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾

"তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক্ব।"[৫১] অন্যত্র বলেন :

﴿كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾

"কখনই নয়, বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না এবং তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করো না, অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে।"[৫২]

সম্পদশালী বিত্তশালী লোকের অভাব নেই কিন্তু প্রয়োজনীয় সময়ে গরিব, দুঃখী ও মেহনতী মানুষের পাশে দাঁড়াবার মানুষ নেই? মহান আল্লাহর বাণী, রাসূল (ﷺ)-এর মহান বাণী শুধু কিতাবেই আছে বাস্তবে নেই। সেই মহৎ হৃদয়বান ব্যক্তি কোথায়? কাজী নজরুল ইসলাম বলেন,

"তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা করো হযরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ।"

নিজের ভোগ বিলাস ও উদরপূর্তির ভেতরে কোনো আত্মতৃপ্তি নেই; বরং অর্জিত সম্পদ মানুষের মাঝে দান করলে পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। সাহাবীদের জীবনী থেকেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এমন কে আছে যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে নিজের সাথে খাওয়াতে পারো? তখন এক আনসারী সাহাবী (আবূ ত্বালহাহ্) বললেন, আমি। অতঃপর তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মেহমানকে

[৫০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[৫১] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ১৯।*
[৫২] *সূরা আল ফাজর : ১৭-১৮।*

সম্মান করো, স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত করো, বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তিনি (স্ত্রী) বাতি জ্বালালেন, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ালেন এবং সামান্য খাদ্য যা প্রস্তুত ছিল তা (মেহমানের সামনে) উপস্থিত করলেন। অতঃপর বাতি ঠিক করার অযুহাতে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মতো শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তারাও তার সাথে খাচ্ছেন। অথচ উভয়েই অভুক্ত রাত কাটালেন। ভোরে যখন তিনি (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসেছেন অথবা খুশি হয়েছেন। এ (সূরা আল হাশ্‌র-এর ৯ নং) আয়াত নাযিল করেছেন,

"তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।"[৫৩]

তাই ঈদের আনন্দে কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুখ-দুঃখকে একে অপরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার চেষ্টা করি।

ঈদ উৎসবে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব : ঈদ উপলক্ষে চলে ব্যক্তি বা পরিবারে কেনাকাটার মহা ধুমধাম। কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তবুও ঈদ উপলক্ষে নূতন জামা-কাপড়, শাড়ি, গহনা কেনার প্রতিযোগিতা। ঈদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় বসে মেলা, সেখানে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা মেতে উঠে পোশাকের কথায়। কে কত দামী পোশাক পড়ে শরীর প্রদর্শনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে চলে তার প্রতিযোগিতা এক শ্রেণির যুবক-যুবতী দল বেঁধে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন পার্কে, সিনেমা হলে, এমন স্পটে। তারা ভুলে যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা মেতে উঠে অপসংস্কৃতির দেউলিয়াত্বে। ঈদের জামা'আতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে চলে আর একটি তুলকালাম কাণ্ড। কোনো অনিবার্য কারণ বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভোগ ছাড়াই ঈদগাহের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, মসজিদভিত্তিক ঈদের জামা'আত। অনেক সময় দেখা যায় ঈদের মাঠে মারামারি, খুন খারাবির ঘটনা। ঈদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি হস্তক্ষেপ করে জাতীয়ভাবে রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। কিন্তু অনুষ্ঠানের ধরন এমনটি কুরুচিপূর্ণ যা পরিবারের সবাইকে নিয়ে উপভোগ করা যায় না। অতএব, আমাদের যুব সমাজ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সুশীল সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। কোনো এলাকার বিত্তবান লোকজন যদি যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করে তহবিল গঠন করে দরিদ্র লোকদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলেও গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পরিকল্পিতভাবে দুঃস্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন, ইয়াতিম, মিসকিনদের মধ্যে বাছাই করে প্রতি বছর অন্তত তিন চারটি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য রিক্সা, ভ্যান, সেলাইমেশিন কিংবা ছাগল ইত্যাদি কিনে পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসবে আর তারা সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারবে। রাসূল (ﷺ) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে সম্পদ অর্জনে মানুষের অতিরিক্ত লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে পার্থিব জীবনকে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পরকালীন সাফল্যের এ চেতনাবোধ মানুষকে সংযমী হবার প্রেরণা জোগায়। বেড়ে যায় সাহায্য ও সহযোগিতার পরিমাণ। কমে যায়, পরনির্ভরশীলতা ও দরিদ্রতা। পরিশেষে আহ্বান করি আসুন, আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঈদের আনন্দকে ধনী-গরিব সবার মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে নেই। কবির ভাষায় বলতে হয় :

"আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি পরে
প্রত্যেক মোরা পরের তরে।"

[৫৩] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

কিশোর ভুবন

হাতিব ইবনু আবী বালতায়া : এক বদরী সাহাবীর ঘটনা

–আবু তাসনীম*

প্রতিশ্রুতি পালন, উপকারের প্রতিদান দেওয়া এবং স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন দরদ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি যে পত্রটি লেখেন তা ছিল মূলত এ দরদের তাকিদেই। আর রাসূল (ﷺ) তা উপলব্ধি করেই তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর স্বভাব ছিল কিছুটা রুক্ষ। দাসদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন। এ কারণে রাসূল (ﷺ) ও পরবর্তী খলীফারা মাঝে মাঝে তাঁকে বকাঝকা করে সংশোধন করতেন। একবার তাঁর এক দাস রাসূলে কারীমের (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয়ই হাতিব জাহান্নামে যাবে।

রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। যে ব্যক্তি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশ নিয়েছে সে জাহান্নামে যেতে পারে না।

আবূ আমর ইবনু সাঈফী ইবনে হিশাম ইবনুল আব্দে মানাফের দাসী 'সারা' পবিত্র মক্কা নগরী থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট মদীনায় হাজির হলো। আর তখন সময়টি ছিল রাসূল (ﷺ)-এর মক্কা অভিযানের প্রস্তুতির।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে সারা! তুমি কি হিজরত করে এসেছ? সে বলল, না।

জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমান হয়েছ? সে বলল, না।

তিনি বললেন, তবে কেন এসেছ? উত্তরে সে বলল, আপনারা তো মক্কায় পরিবার-পরিজন, দাস-দাসী সব কিছুর অধিকারী ছিলেন। আমি আমার কঠিন দরিদ্রতার জন্য আপনাদের কাছে এসেছি যাতে আমি আপনাদের কাছে কিছু দান-দাক্ষিণ্য পেয়ে যাই এবং খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, মক্কাবাসী যুবকরা তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারেনি? এই দাসী গায়িকা ছিল, এজন্য তিনি একথা বললেন। সে বলল, বদর যুদ্ধের পর আমাকে একটি ঘাস পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদেরকে দাসীটির জন্য দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আর সাহাবারা তাকে দান করলেন এবং পরিধানের পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপর হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই দাসীর কাছে আসলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তৎপরতা সম্পর্কে জানতেন। সুতরাং তিনি এক গুপ্ত পত্রের মাধ্যমে মক্কাবাসীকে সতর্ক করার জন্য সেই দাসীকে দিলেন এবং পত্র পৌঁছানোর জন্যে দশ দীনার এবং কিছু চাদর তাকে দিলেন।

"সারা" হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিষয়টি গ্রহণ করল এবং চিঠি নিয়ে এলো। আর চিঠির শিরোনাম ছিল,

مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرِيْدُكُمْ فَخُذُوْا حِذْرَكُمْ.

"হাতিব ইবনু আবী বালতায়ার পক্ষ থেকে মক্কাবাসীর কাছে! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের রক্ষার জন্য পন্থা অবলম্বন করো।"

সারা অতি দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। হয়ত সে হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে আরো কিছু পাওয়ার আশা করেছিল। ততক্ষণে আল্লাহ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে ওহী পাঠিয়ে হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গোপন চিঠি সম্পর্কে জানালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সভা ডাকলেন এবং উপস্থিত সাহাবাদের উদ্দেশে বললেন,

"সর্ব প্রথম হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসীর জন্য লিখিত পত্র উদ্ধার করতে হবে। এরপর হাতিবের শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। কেননা, সে আল্লাহর রাসূলের গোপন বিষয় শত্রুর কাছে প্রকাশ করেছে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আম্মার ইবনু ইয়াসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ মুরসাদ লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (সারাকে গ্রেফতারের জন্য) পাঠান। তারা সকলেই ঘোড়-সওয়ার ছিলেন।

নবী (ﷺ) তাদেরকে বললেন, যখন তোমরা 'রাওযা খাখ' নামক স্থানে পৌঁছবে সেখানে গাধায় আরোহী এক মহিলাকে পাবে যার কাছে থাকবে হাতিব ইবনু আবী বালতায়ার লেখা একটি চিঠি যা মুশরিকদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে। তার কাছ থেকে চিঠিটি নিয়ে তাকে ছেড়ে দিও। আর যদি সে চিঠিটি দিতে অস্বীকার করে তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিও।

ঘোড়-সওয়ারদের এই কাফেলা ঘোড়াগুলোকে ক্ষিপ্র গতিতে চালিয়ে এবং পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে মহিলাকে

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

সেই স্থানেই পেয়ে গেলেন, যে স্থানের দিক-নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দিয়েছিলেন। তারা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিটি কোথায় রেখেছ?

মহিলা আল্লাহর কসম করে তাদেরকে বলল : আমার কাছে কোনো প্রকারের চিঠি নেই। ঘোড়-সওয়ারগণ তার মাল-সামানের তল্লাশি করলেন, কিন্তু চিঠি পাওয়া গেল না। এরপর তারা ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিলো।

'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) না আমাদেরকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন, আর না আমাদেরকে মিথ্যাবাদী হতে বাধ্য করেছেন। একথা বলে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের তরবারি কোষ থেকে বের করে ফেলেন এবং দাসীকে ধমক দিয়ে বলেন : চিঠি বের কর! আর না হয় আল্লাহর কসম! আমি তোকে উলঙ্গ করতে বাধ্য হব আর তোর গর্দান উড়িয়ে দিব। যখন দাসী 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষিপ্রতা দেখতে পেল সে বলতে লাগল : আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন আমি চিঠি বের করে দিচ্ছি। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পিছনে সরে দাঁড়ালেন। দাসী নিজের কাপড়ের নীচ থেকে চিঠি বের করে ঘোড়-সওয়ারদের কাছে সোপর্দ করল। এরপর তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিলো।

তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলে হাতিব ইবনু আবী বালতায়াকে ডেকে আনা হলো। যখন সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে হাযির হলো, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি চিঠির বিষয় সম্পর্কে জান?

হাতিব উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, জানি!

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কোনো বিষয় এই অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে?

হাতিব উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর তা ত্যাগ করার কল্পনাও আমার হয়নি। আর না মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের ভালোবাসা আমার অন্তরে কোনো স্থানে করতে পেরেছে। এরপরও যখন আমি দেখলাম যে, মুহাজিরদের মধ্যে প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ মক্কায় এমন আছে, যে তাদের (আত্মীয়-স্বজন)-কে রক্ষা করতে পারেন; কিন্তু আমি তাদের মধ্যে এক বিজাতীয় লোক, অথচ আমার পরিবার-পরিজন ও বংশ সেই সব মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করছে। এজন্য আমি আমার পরিবারের জন্য আশঙ্কায় ছিলাম। তাই আমি কুরাইশদের এই সহযোগিতা করতে চেয়েছি (যাতে আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করে) আর আমি এটা দৃঢ় বিশ্বাস করতাম যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাদের শায়েস্তা করবেন। আর আমার এই চিঠি কোনো কাজে আসবে না।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হাতিব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবার পরিজন তাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ক্ষতিকর হবে না-এমনটি মনে করেই আমি চিঠিটি লিখেছি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। কিন্তু মক্কায় আমি ছিলাম একজন বহিরাগত এবং সেখানে আমার মা, ভাই ও ছেলেরা রয়েছে।[৫৪]

রাসূল (ﷺ) হাতিব ইবনু আবী বালতায়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা সত্য বলে বিশ্বাস করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। এরপর 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার রাস্তা ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন–

وَمَا يُدْرِيْكَ يَا عُمَرُ! فَلَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُمْ : اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"হে 'উমার! তুমি কি জান! হয়ত আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবাদের বিষয়ে জেনেই বলেছেন : তোমরা যা চাও তাই কর! নিশ্চয় আমি তোমাদের পাপ মোচন করে দিয়েছি।"[৫৫]

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ; অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস করো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।"[৫৬]

রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা আবূ বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে দ্বিতীয়বার মাকুকাসের দরবারে পাঠান এবং মাকুকাসের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মিসর জয়ের পূর্ব পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে এ চুক্তি বহাল থাকে।[৫৭]

হিজরী ৩০ সনে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। ❑

---

[৫৪] *আল ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা- ১/৩০০; হায়াতুস সাহাবা- ২/৪২৫।*
[৫৫] *ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার আল আসকালানী, তাফসীরে কুরতুবী।*
[৫৬] *সূরা আল মুমতাহিনা : ১।*
[৫৭] *আল ইসতিয়াব।*

রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন

গত ২৫ মার্চ শনিবার রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে জেলা কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার অন্তর্গত নওহাটা গরুহাট আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল **১১**টায় অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী (পশ্চিম) জেলার আহ্বায়ক শাইখ আব্দুর রহমান কারামী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি **প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি **প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী,** উপদেষ্টা **অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী**, সাংগঠনিক সেক্রেটারি **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন**, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি **শাইখ মাসউদুল আলম আল-উমরী**, শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি **প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**, রাজশাহী জেলা জমঈয়তের সাবেক সেক্রেটারি **প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান** ও পবা উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান **মো. ওয়াজেদ আলী খান**।

উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অধিবেশনে আগত জেলার প্রতিটি উপজেলার সভাপতি, সেক্রেটারি এবং জমঈয়ত হিতৈষী সুধীজনের সাথে দীর্ঘ পরামর্শের ভিত্তিতে রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নতুন কমিটি গঠন করেন। এ মর্মে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর এবং রাজশাহী জেলা জমঈয়তের সাবেক সেক্রেটারি ড. মো. মতিউর রহমানকে সভাপতি এবং শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ ফারুককে সেক্রেটারি করে ১৮ সদস্যের রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। একই সাথে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিষদের বাকি **১৯** জন সদস্য মনোনয়নের জন্য উক্ত কার্যকরী পরিষদকে এক মাসের সময় প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক গত ২ এপ্রিল রবিবার বিকাল ৩টায় রাজশাহীর তালাইমারী (বাদুড়তলা) আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা সভাপতি ড. মো. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত সকলের আলোচনার ভিত্তিতে পরিষদের বাকি **১৯**জন সদস্য মনোনয়নের মাধ্যমে রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৩৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়াও জমঈয়তের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির লক্ষ্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলার সাবেক আহ্বায়ক কমিটিকে ধন্যবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কমিটির বিবরণ- সভাপতি- প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান, সহ-সভাপতিবৃন্দ- আব্দুর রহমান কারামী, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সেক্রেটারি- মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ফারুক, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, সহকারী সেক্রেটারি-১- অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ, সহকারী সেক্রেটারি-২- অধ্যাপক মুহাম্মদ তাজরুল হক দেওয়ান, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- মুহাম্মদ আব্দুল গফুর মাদানী, তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক- মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মতিন, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- ইসরাফিল হোসাইন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- ক্বারী মুহাম্মদ মোকসেদ আলী, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- হাফেয মুহাম্মদ আজিমুদ্দীন, পাঠাগার সম্পাদক- মুহাম্মাদ ইখলাসুর রহমান, দফতর সম্পাদক- মুহাম্মাদ ইমরান আলী। **সদস্যবৃন্দ–** মুহাম্মদ মজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দুরুল হোদা, মুহাম্মদ আব্দুল বারী, মুহাম্মদ মাহবূবুল বারী, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী (কাকনহাট), ডা. মুহাম্মদ ওয়াসিম, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ আসলামুদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মুনসুর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অধ্যাপক আইনুল হক, উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ বাবুল আখতার, মীর মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফেয ইদ্রিস আলী, মোহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা ও ইফতার মাহফিল

মাহে রামাযানে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ১৫ রামাযান ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খানের সভাপতিত্বে ঝিনাইদহ আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সাব্বির আহমদের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের উপস্থাপনায় সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং সালাতুল আসর পর্যন্ত প্রোগ্রাম স্থায়ী হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের আইন ও সম্পত্তি বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুর রহমান (বাবলু), জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-রেজিস্ট্রার হাফেয মো. আবু মুছা। জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী, অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ ইমরানুর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ মিকাইল ইসলাম ও মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (বকুল), তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহা. আব্দুস সামাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইমদাদুল হক-সহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীবৃন্দ। **"শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সৌদি সরকারের অবদান ও দৃশ্যপটে বাংলাদেশ"** শীর্ষক জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। বাদ জুমু'আহ্ জেলা সভাপতির সভাপতিত্বে সাধারণ সভা ও ইফতার মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের আলোচনা সভা

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে মাহে রামাযানের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ রামাযান, মোতাবেক ৩১ মার্চ শুক্রবার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সদর এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক মো. সেকেন্দার আলী।

বাদ জুমু'আহ্ থেকে ইফতার পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্যসূচি মোতাবেক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন শুব্বান সদস্য হাফেয রাসেদুল হক, দরসে কুরআন পেশ করেন বাগেরহাট জেলা শুব্বান সেক্রেটারি হাফেয আল মামুন, দরসে হাদীস পেশ করে বাগেরহাট জেলা শুব্বান সভাপতি শফিকুল ইসলাম আরিফ।

ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন শুব্বান সদস্য জুবায়ের আহমদ ও জিউন গাজী।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম বিন ফজলুল হক, বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো. ইউসুফ আলী, খুলনা জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ জালাল উদ্দিন মাদানী, শাইখ শাহরুল মাদানী, বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের দাওয়া ও তাবলীগ সম্পাদক শাইখ আব্দুস সালাম বিন আনোয়ার, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম বিন আসগর আলী, খুলনা আল মাহাদ আস সালাফীর ছাত্র এহসান বিন আনসার উদ্দিন ও আবূ হুরাইরাহ্ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত জমঈয়ত ও শুব্বানের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

ইফতার মাহফিলে বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান খাঁন রেজাউল ইসলাম ও বেরতা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আসাদুজ্জামান মোহনা উপস্থিত

ছিলেন। পরিশেষে ইফতার গ্রহণের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় দফতরের দীর্ঘদিনের খাদেম মুহাম্মদ কাজীম উদ্দীন (৮২) বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি গত ১৫ এপ্রিল, শনিবার বেলা সাড়ে ৩টায় মৃত্যুবরণ করেছেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দফতর হতে মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, (আমীন)।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত আল আরাবিয়াতুস সালাফিয়া ওয়া তাহফিজুল কুরআন মাদ্‌রাসার হিফজুল কুরআন শাখায় একজন অভিজ্ঞ হাফেয নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ দরখাস্ত আহ্বান করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

পরিচালক, **খালেকুজ্জামান (রুবেল)**

আল আরাবিয়াতুস সালাফিয়া ওয়া তাহফিজুল কুরআন মাদ্‌রাসা

মসজিদে মোবারক, ফতেহ আলী ব্রীজ মোড়, বগুড়া

মোবাঃ ০১৭১১-১৪২৪৬০

ইমাম কাম খতীব আবশ্যক

ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে 'বায়তুর রহমান জামে মসজিদে'র জন্য এক দক্ষ ইমাম কাম খতীব আবশ্যক। প্রার্থীকে দাওরা হাদীস/কামিল সনদধারী হতে হবে। হিফয সম্পন্নকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ। সালাফী 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজের অনুসারীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

মুতাওয়াল্লী, আবু নাবিহা সেলিম

বায়তুর রহমান জামে মসজিদ

রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর

মোবাইল : ০১৬৮৬-২৪ ৩৪ ৭৪

ঈদের জামা'আত

ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল ফিতরের প্রধান জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে **সকাল সাড়ে ৭টায়** অনুষ্ঠিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। এছাড়াও মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ি) মাঠে, মিরপুর এম.ডি.সি স্কুল মাঠে, বারিধারা লেক সংলগ্ন মাঠে, মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড সংলগ্ন মাঠে, টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইনশা-আল্লাহ। সকল জামা'আতে মহিলাদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঈদ শুভেচ্ছা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল দায়িত্বশীল, কর্মী, সুধী ও জমঈয়ত হিতৈষী এবং সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্মানিত লেখক-গবেষক, কলাকুশলী, পাঠক-পাঠিকাসহ মুসলিম উম্মাহকে জানাই ঈদুল ফিত্‌র-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা–

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَال.

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের 'আমলে সালেহ্ কবূল করুন- আমীন। ***–সম্পাদক***

ঈদের ছুটি

পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র- ১৪৪৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও সাপ্তাহিক আরাফাত অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব, আগামী ০১ মে সোমবার সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে না। তৎপরিবর্তে ৬৪ বর্ষ, ৩১-৩২ সংখ্যা আগামী ০৮ মে, সোমবার প্রকাশিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। ***–সম্পাদক***

কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল

কর্মীদের সাংগঠনিক মানোন্নয়ন ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গত **৩১ মার্চ শুক্রবার** এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করে। ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার হল রুমে (৪র্থ তলায়) দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতিত্বে শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী সকাল ১০ টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলামের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের সহকারী অফিসার (তা'লীমুল কুরআন) হাফেয আল-আমীন বিন আকমালের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়। উদ্বোধনী ও প্রধান অতিথির বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। এরপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন দেশের খ্যাতনামা আলেম ও বরেণ্য ইসলামিক স্কলারগণ।

দারসুল কুরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ ও মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহর সিনিয়র মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী। অতঃপর আলোচ্যসূচি মোতাবেক "উভয় জগতে সাফল্যের রূপরেখা" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন মাদ্‌রাসাতুল হাদীস নাজিরা বাজার, ঢাকা এর অধ্যক্ষ শাইখ ড. যাকারিয়া বিন আব্দুল জলিল মাদানী। "ইসলামী নেতৃত্বের সফলতার গুণাবলী" বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম। "আত্মশুদ্ধি ও আনুগত্য" শীর্ষক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন। "লিডারশিপ এবং বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সৃষ্টি শিক্ষা পরিবারের চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলাম রিপন। অনুষ্ঠানটিতে ইসলামি সংগীত পরিবেশন করেন শুব্বানের সাংস্কৃতিক সংগঠন শেকড়ের সদস্যবৃন্দ। বিকাল ৪টায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। এ কর্মশালায় সারাদেশ হতে আগত ১৫০ জন কর্মী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিকাল ৪টার পর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলামের পরিচালনায়, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানীর সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ড. শরিফুল ইসলাম রিপন। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, বিশেষ আলোচক হিসেবে আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন ও শাইখ মুফায্‌যল হুসাইন মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, দফতর বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম, দারুল হুদা কমপ্লেক্সের পরিচালক শাইখ ড. মোজাফ্‌ফর বিন মহসিন, দি ম্যাসেজ ফাউন্ডেশনের চেয়াম্যান শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : সাদাক্বাতুল ফিত্‌র (ফিত্‌রা), যাকাত ও কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ের টাকা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সূরা ও আয়াত নং সহ সহীহ হাদীস মোতাবেক (হা.সহ) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভাগ/বন্টনের নীতিমালা বিস্তারিত জানতে চাই।

মো. আতিকুর রহমান
মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : যাকাত বন্টনের কথা আল্লাহ খাতওয়ারী আল কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন– *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০)*। যাকাতুল ফিতর মূলত গরিব মিসকিনদের হক্ব– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬০৯)*। কুরবানী পশুর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাও অনুরূপভাবে বন্টন করে দিতে হবে। ইসলামের বন্টননীতি সকল যুগে ও প্রেক্ষাপটে সমভাবে প্রযোজ্য। 'ফি সাবিলিল্লাহ' ও 'দাসমুক্তি'র খাতদ্বয়ও যথারীতি বলবদ থাকবে। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য সেসব খাত এটার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাতেও ব্যয় করা যাবে। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করেন। আমার প্রশ্ন– মসজিদ ছাড়া বাড়িতে ই'তিকাফ করা জায়িয হবে কি? এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কিছুটা বিতর্ক চলছে। দয়া করে দলিল ভিত্তিক জবাব দেবেন। *ফুরকান উদ্দিন*
জলঢাকা, নীলফামারী।

জবাব : ই'তিকাফ মসজিদেই করতে হয়। বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ করলে তা সঠিক হবে না; বরং এটিকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বৈরাগ্যতা বলা হবে। আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফকে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫ ও ১৮৭)*। কেননা, ই'তিকাফের পারিভাষিক অর্থই হচ্ছে– মহান আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য মসজিদে অবস্থান করা– *(আশ্ শারহুল মুমতি'আ- ৬/৪৯৯)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন। এ কারণে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়িতে ই'তিকাফ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যা দিয়েছেন– *(বায়হাক্বী- ৪/৩১৬)*। কাজেই ক্বিয়াসভিত্তিক ফাতওয়ার আলোকে কারো বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ জায়িয হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমি যদি ই'তিকাফে থাকি আর কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়, তাহলে তার জানাযার সালাতে শরিক হতে পারব কি? বিগত দিনগুলোতে আমরা ই'তিকাফকারীকে এমন সমস্যার মুখোমুখী হতে দেখেছি। তাই বিষয়টি আগে-ভাগে জেনে নেয়াটা সংগত মনে করছি। আশাকরি আপনাদের কাছে সঠিক উত্তর পাব।

মো. খায়রুল বাশার
পুঠিয়া, রাজশাহী।

জবাব : ই'তিকাফ অবস্থায় কারো জানাযায় যাওয়া জায়িয নয়– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৭৩)*। তবে কোনো কারণবশতঃ মসজিদে জানাযা হাজির করা হলে তাতে শরিক হওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমাদের কোনো কোনো ভাই রামাযানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ না করে শেষের ৩ দিন করে থাকেন। এরূপ ই'তিকাফের বিধান কি?

হা. মনোয়ারুর ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : রামাযানের ই'তিকাফ শেষের ১০ দিন করা সুন্নাত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭২)*। এর কম করার কোনো বিধান নেই। রামাযান ছাড়া অন্য মাসে যে যতটুকু সময় চাইবে ই'তিকাফ করতে পারবে। কিন্তু রামাযানে নিজের ইচ্ছেমত কম করায় কোনো সুযোগ নেই। পারলে সুন্নাত মুতাবিক ১০ দিন ই'তিকাফ করবে, নতুবা ছেড়ে দেবে– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৭)*।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে ই'তিকাফ করতে চাই। শুনেছি ২১ রামাযান ফজরের পর ই'তিকাফে বসতে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পর প্রবেশ করেত হয়। আসলে কোন্‌টি ঠিক? দলিলসহ উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন। *মো. লুৎফুর রহমান*
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ২১ রামাযানের ফজর সালাত আদায় করে ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন– ***(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৬৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৯১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৭০৯ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৭১)***। আপনি ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ করে 'ইবাদত-বন্দেগী করবেন এবং রাত শেষে ফজরের সালাত আদায় করে ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত পর্দাবৃত্ত স্থানে প্রবেশ করবেন। এটি বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আর হাদীসের বর্ণনা তাই বুঝায়।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যদি ই'তিকাফ করি, তাহলে কোনো প্রয়োজনে আমি আমার স্ত্রীর কোনো খিদমাত নিতে পারব কি? একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।

মো. ইশতিয়াক্ব
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি মসজিদে থেকেই আপনার স্ত্রীর দ্বারা কোনো খিদমাত নিতে পারবেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "ই'তিকাফ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর চুল পরিপাটি করে দিতাম।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭)* তবে অবশ্যই সর্বপ্রকার শাহাওয়াত বা প্রবৃত্তির চাহিদা হতে পবিত্র-মুক্ত থাকতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : যাকাতুল ফিত্র যাকে আমরা ফিতরা বলি, তা ফর্য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক কি না? আমাদের সমাজের 'আলিমগণ বলেন– ফিতরার জন্যও নিসাব প্রয়োজন। তা না হলে ফিতরা ফর্য হবে না। এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে সঠিক উত্তর পাব বলে একান্ত আশাবাদী।

মো. ফুয়াদ আল-আমীন
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

জবাব : যাকাতুল ফিত্র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতরা ফর্য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর যাকাতুল ফিত্র ফর্য করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬১১; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৭৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫০০ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫)*। এখানে নিসাবের কোনো কথা উল্লেখ নেই। কাজেই যারা নিসাবের কথা বলবে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করবে– যা সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (০৮) : যাকাতুল ফিত্র আদায় করার নিয়ম কি? কোনো কারণবশতঃ ঈদের পর আদায় করলে চলবে কি? আমি একটি হাদীসে পড়েছি– ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে না-কি সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হয়। আসলে একথার সত্যতা কতখানি? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

মো. সোহেল রানা
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : ঈদের দিন ফজরের পর হতে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হয়– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬০৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮২৭)*। ঈদের পর আদায় করা সুন্নাত বিরোধী। আর সুন্নাত বিরোধী কাজ কেউ করলে সে গুনাহগার হবে। তাই বলে আদায় না করে কোনো উপায় নেই। ফিতরা প্রদান করতে হবে এবং বিলম্বের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো ব্যক্তি ঈদের দু'এক দিন আগে তা আদায় করে দিতে পারে। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 'আমল দ্বারা তা প্রমাণিত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১ ও সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২৩৯৭)*।

আর আপনার জিজ্ঞাসা মতে ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে তা সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হবে মর্মে বর্ণিত হাদীসখানা সহীহ, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ- শরিয়ত নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার কারণে সাওয়াবের দিক থেকে কিছুটা কম বলে বিবেচিত হবে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আল কুরআনে যাকাত ব্যয়-এর যে ৮টি খাত বলা হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে ফক্বীর ও মিসকীন। আমার প্রশ্ন– ফক্বীর ও মিসকীন কাকে বলে? এ দু'য়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।

মুন্তাসির আহমাদ
শ্রীপুর, গাজীপুর।

জবাব : যাকাত ব্যয়-এর নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যে ফক্বীর ও মিসকীন দু'টি খাত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে সহজেই অনুমেয় যে, খাত দু'টির মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ফক্বীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দু'এক বেলার খাবারও জোটে না। আর মিসকীন বলা হয়– যার কিছু আছে, তবে তা দিয়ে তার প্রয়োজন মেটে না– *(সূরা আল হাশ্র : ৮; সূরা আল কাহ্ফ : ৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসকিনী জীবন কামনা করলেও ফক্বিরী জীবন হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৭১৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৪৪, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৮১ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৩১)*।

জিজ্ঞাসা (১০) : আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও দেখা যায়, ঈদের সালাত সর্বদা মসজিদে আদায় করেন। আবার বেশিরভাগ খোলা মাঠে আদায় করে থাকেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মূলতঃ কোন্‌টি ঠিক? জানিয়ে ধন্য করবেন।

ফায়সাল আহমাদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : ঈদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত– *(বুখারী- ৯৫৬ ও মুসলিম- ৮৮৯)*। আমরা সামান্য খেয়াল করলে দেখতে পাব– মসজিদে নববীর মতো কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। শর'ঈ কারণ ছাড়া মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী। তবে বৃষ্টিজনিত কারণে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় জায়িয রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১১) : ঈদুল ফিত্র-এর তাকবীর কখন থেকে শুরু করতে হবে এবং কোন সময় পর্যন্ত বলতে হবে? এ

ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানালে খুবই উপকৃত হব। *হুমায়ূন কবির*
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

জবাব : রামাযানের পূর্ণতার পর সূর্যাস্ত হলে কিংবা ২৯ রামাযান অতিক্রমের পর ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই তাকবীর বলা শুরু করতে হবে এবং ঈদের সালাত পর্যন্ত এ তাকবীর চলবে– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)*। আর ঈদের তাকবীর হবে নিম্নরূপ :

"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।" ভিন্ন শব্দেও তাকবীর বর্ণিত আছে। *(সহীহুল বুখারী- ফাতহুল বারী, ২/৪৬২)*

উল্লেখ্য যে, এ তাকবীর প্রত্যেক মুসলিম নিজে নিজে উচ্চঃকণ্ঠে বলবে; সম্মিলিতভাবে বলার কোনো প্রমাণ সহীহ সুন্নাতে নেই। পৃথক পৃথক বলার মাধ্যমে সমস্বর হলে কোনো অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লাহু 'আলামু।

জিজ্ঞাসা (১২) : আমাদের এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় ঈদের সালাতে মহিলা জামা'আত ও মহিলা ইমাম দ্বারা খুতবাহ্ ও সালাত পরিচালিত হয়ে আসছে। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এভাবে সালাত আদায়ের যুক্তিকতা জানতে চাই। *আতিকুর রহমান*
মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে মুসলিমদের জামা'আতে শামিল হয়ে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত।

মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে আলাদা জামা'আত করে সালাত আদায় করার কোনো বিধান ইসলামী শরিয়তে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও বাদ দেননি। তারা সালাতে শামিল হবে না; তবে কল্যাণময় এ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করবে এবং মুসলিমদের দু'আয় শরিক হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪ ও সহীহ মুসলিম হা. ৮৯০)*

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের জন্য পৃথক জামা'আতের নির্দেশ দেননি। সেহেতু প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থায় মহিলা জামা'আত সুন্নাতসম্মত হবে না। وَاللهُ أَعْلَمُ

জিজ্ঞাসা (১৩) : ঘুম থেকে উঠে দেখি স্বপ্নদোষ হয়েছে। এমতাবস্থায় গোসল না করেই সাহ্রী খাওয়া যাবে কি?
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : সাহ্রী খাওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত নহে তবে সময়-সুযোগ থাকলে গোসল করে নেয়াই ভালো। হাদীসে এসেছে– "নবী কারীম (ﷺ) জানাবাতের গোসল ফর্য অবস্থাতেই ফজর হয়ে গেলে তিনি গোসল করে রোযা রেখেছেন। আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জানাবাতের গোসল করাটা হলো শর্ত। যার কারণে ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল বিলম্ব করাটা জায়িয নয়। যেহেতু ফজরের নামায যথা সময়ে পড়া ওয়াজিব। তবে হ্যাঁ, যদি নাপাকি অবস্থায় কোনো ব্যক্তির গভীর ঘুম চলে আসে এবং সূর্য উঠার বেশ কিছু পর জাগ্রত হয়, তাহলে সে গোসল করে ফজরের নামায আদায় করবে এবং রোযাও পালন করবে। এমনিভাবে কোনো রোযাদার যদি দিনের বেলা ঘুমায় আর স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তাহলে তারও রোযা ভঙ্গ হবে না। যোহর অথবা 'আসর নামাযের পূর্বেই গোসল করে নিয়ে নামায আদায় করবে এবং রোযাও পালন করবে।" *(ফাতাওয়া আস্-সিয়াম শাইখ জাবরীন- ৩১ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (১৪) : অর্থ আত্মসাতের অভিযোগসহ অন্যান্য গুরুতর অভিযোগে ধৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য কি যাকাত ফিত্রার অংশ দেয়া যাবে? *আদনান আবুল খায়ের*
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় অথবা এমন অভাবী যে, নিজেকে মুক্ত করার মতো অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং সে যদি স্বীয় কৃত অপরাধে লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় অপরাধ করার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার মুক্তির জন্য যাকাতের খাত থেকে অংশ দেয়া যাবে– অন্যথায় দেয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা আত্ তাওবাহ্'র ৬০ নং আয়াতে যাকাত প্রদানের ৮টি খাতের আলোচনা এসেছে। তার মাঝে একটি খাত হচ্ছে– الغارمين তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

وَأَمَّا الْغَارِمُوْنَ : فَهُمْ أَقْسَامٌ : فَمِنْهُمْ مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً أَوْ ضَمِنَ دَيْنًا فَلَزِمَهُ فَأَجْحَفَ بِمَالِهِ، أَوْ غَرِمَ فِيْ أَدَاءِ دِيَتِهِ أَوْ فِيْ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَابَ، فَهَؤُلَاءِ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কয়েক প্রকার। এমন ব্যক্তি যে অন্যের রক্তপণ বা মুক্তিপণের দায়িত্ব নিয়েছে অথবা এমন ব্যক্তি যে আপন ঋণ পরিশোধে হাবুডুবু খাচ্ছে অথবা কোন গুনাহের কাজে। অতঃপর সে তাওবাহ্ করেছে, এমন ব্যক্তিদের প্রদান করা যাবে। *(তাফসীর ইবনু কাসীর- ২/৪৭৯)*

ইমাম শাওকানী ও ইমাম কুরতুবী বলেছেন–

هُمُ الَّذِيْنَ رَكِبَتْهُمُ الدُّيُوْنُ وَلَا وَفَاءَ عِنْدِهِمْ بِهَا، وَلَا خِلَافَ فِيْ ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِيْ سَفَاهَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ.

(যাদের উপর ঋণ চেপে বসেছে অথচ তা পরিশোধ করার মতো সম্পদ তাদের কাছে নেই। এদেরকে যাকাতের মাল

হতে প্রদান করা যাবে।) এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যার উপর রক্তপণের বোঝা চেপেছে তাকে প্রদান করা যাবে না। যাকাত থেকেও নয়, অন্য কোনো খাত থেকেও নয়, তবে যদি তাওবাহ্ করে– *(ফতহুল কাদীর- ২/৫৪১; তাফসীরে কুরতুবী- ৮/১৬৬)*। মুফাস্সীরগণ তাদের তাফসীরের সমর্থনে নিম্নোক্ত সহীহ হাদীস পেশ করেছেন–

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

কবীসাহ্ ইবনু মাখারিক আল হেলালী বলেন : আমি রক্তপণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম। অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গমন করে সে ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা করো, সাদাক্বার মাল আসলে সেখান থেকে তোমাকে প্রদানের নির্দেশ দিব। *(সহীহ মুসলিম- ২/৭২২, হা. ১০৪৪; সুনান আবূ দাউদ- ১/৫১৫, হা. ১৬৪০; সুনান আন্ নাসায়ী- ৫/৮৮, হা. ২৫৭৯; মুসনাদ আহমাদ- ৩/৪৭৭, হা. ১৫৯৫৭; আলবানী : সহীহ তাহ্ক্বীক্বুল মিশকা-তুল মাসা-বীহ- ১/৪১৪, হা. ১৮৩৭-সহ প্রায় আরো ৭টি গ্রন্থে)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর রামাযান মাস এসে যায়। আমি নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে সে সময় রামাযানের সিয়াম রাখতে পারিনি। এটি আজ থেকে ১৭ বছর আগের কথা। বর্তমানে আমার মাঝে এ ক্বাযা সিয়াম আদায় করার প্রবল ইচ্ছা জাগছে। এক্ষণ কিভাবে আমি এ সিয়াম আদায় করব? আর দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আমার উপর কোন কাফ্ফারা আসবে কি? দয়া করে মাস'আলাটি দিয়ে আমার এ চিন্তা দূর করবেন।

উম্মে ইক্ববাল
টংগী, গাজীপুর।

জবাব : ক্বাযা সিয়াম পরবর্তী রামাযান মাস আসার আগেই আদায় করতে হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পরবর্তী শা'বান মাস তথা রামাযানের আগেই বিগত বছরের ক্বাযা সিয়াম আদায় করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৬)* এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এক রামাযানের সিয়াম অন্য রামাযান আসার আগে আদায় করতে হবে; দ্বিতীয় রামাযান অতিক্রম করা যাবে না। অধিকাংশ 'আলেম এরূপ বিলম্ব করাকে জায়িয মনে করেননি। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলার ক্বাযা সিয়াম আদায়ে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। তাই আর বিলম্ব না করে দ্রুত ঐ সিয়ামগুলো আদায় করুন। উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ বিলম্বের জন্য কাফ্ফার লাগবে কি না, তা নিয়ে উলামাদের মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি, বিধায় কাফ্ফারা লাগবে না– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪)*। এ বিলম্বের জন্য খালিস নিয়তে তাওবাহ্ করতে হবে। আশাকরি দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন।

জিজ্ঞাসা (১৬) : আমি মাঝে মাঝে নফল সিয়াম পালন করি। কখনো অসুবিধায় পড়ে তা ভাঙ্গতে হয়। আমাকে একজন 'আলেম বললেন : সিয়ামের নিয়ত করলে না-কি তাছাড়া নিষেধ! আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। আশাকরি সঠিক উত্তর পাব। *আব্দুর রহমান আযাদ*
পুঠিয়া, রাজশাহী।

জবাব : নফল সিয়াম প্রয়োজনে ছেড়ে দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। নফল সিয়াম ঐচ্ছিক; আবশ্যক নয়। তাই সিয়াম পালনকারী নিজে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সিয়াম পূরা করবে কিংবা ছেড়ে দেবে। একদা রাসূল (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– খাবার কিছু আছে কি? তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর (ﷺ) জন্য ছাতু পেশ করলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : "আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছি। অতঃপর (সিয়াম ভেঙ্গে) তাথেকে কিছু খেলেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৪)*

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নফল সিয়াম পালনকারী তার ইচ্ছানুযায়ী সিয়াম ছাড়তে পারে। অনুরূপ সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নফল সিয়াম ভাঙ্গাকে কিছুই মনে করতেন না। *(মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক্ব- হা. ৭৭৬৭)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : আমার জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে আমার পরিবারের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করি; কোনো কোনো বছর হয়তো কিছু উদ্বৃত্ত হয়- এখন প্রশ্ন হলো– আমার ওপর কি হজ্জ ফর্‌য হয়েছে? *মুহা. রাসেল*
খানসামা, দিনাজপুর।

জবাব : একজন মুসলিমের ওপর হজ্জ ফর্‌য হওয়ার জন্য যে দু'টি বিশেষ শর্তারোপ করা হয়েছে, তা হলো– শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য। আর আর্থিক সামর্থ্যের সঠিক কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি; বরং আমাদের ঈমানের সত্যতার প্রমাণের ওপর রেখে দিয়েছেন। সহজ অর্থে এখানে সামর্থ্য বলতে হজ্জ সফরে যাওয়ার, সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করার এবং সফরকালীন সময় পরিবারবর্গকে প্রয়োজনীয় খাবার ব্যবস্থা করে যাওয়াকে বুঝায়। এতটুকু আর্থিক সামর্থ্য হলে হজ্জ ফর্‌য হয়ে যাবে। প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে বুঝা যায়– তিনি পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী নন। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করার পর যখন দেখা যাবে যে, তার পক্ষে হজ্জের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব, তখনই তার উপর হজ্জ ফর্‌য হবে, অন্যাথায় নয়। *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭; সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬; আল উদ্দা শারহুল উমদাহ- ১/১৭৮ পৃ.)* ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ

মসজিদুল আকসা

–আহমাদ রফিক★

আল কুদ্‌স, আল আকসা, মসজিদুল আকসা, বাইতুল মুকাদ্দাস বা বাইতুল মাকদিস। ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। মুসলিমদের প্রথম কিবলা। সারা পৃথিবীর মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন। যেখান থেকে শুরু মিরাজের পবিত্র ভ্রমণ। মহান রবের সঙ্গে মনোনীত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার। যেখানে শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ইমামতিতে একত্রিত হয়েছিলেন সকল নবী ও রাসূল। আলাইহিমুস্ সালাত ওয়াস সালাম।

ইতিহাস : প্রচলিত আছে যে, মসজিদুল আকসা নির্মাণ করেছেন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)। যদিও এই তথ্য ভুল। মসজিদুল আকসার সর্বপ্রথম নির্মাতা হলেন ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)। মসজিদুল আকসা নির্মাণ করা হয় মসজিদুল হারাম নির্মাণের মাত্র চল্লিশ বছর পর। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন : মসজিদুল হারাম। আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন : তারপর মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন : চল্লিশ বছরের।[৫৮]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এ হাদীসটি তাদের জন্য বোঝা কষ্টকর যারা এতে কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা জানে না। কেউ হয়তো বলতে পারে– "এ তো সবাই জানে যে নবী সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) মসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন এবং তাঁর ও ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান।" এর দ্বারা এমন ব্যক্তির অজ্ঞতা বুঝা যায়। কেননা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তো শুধুমাত্র আল আকসা পুনর্নির্মাণ ও নতুন রূপ দান করেছেন। তিনি মোটেও সর্বপ্রথম এটি প্রতিষ্ঠা করেননি বা নির্মাণ করেননি; বরং যিনি প্রকৃতপক্ষে এটি নির্মাণ করেন তিনি হচ্ছেন ইয়া'কুব বিন ইসহাক (আলাইহিস সালাম) এবং এটি ছিল মক্কায় ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাবা নির্মাণের পরবর্তীকালে।"

ঐতিহাসিকদের মাঝে প্রচলিত তথ্যমতে, মসজিদুল আকসা নির্মিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৯৫৭ সালে। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০৪ সালে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

নামকরণ : আল আকসা শব্দের অর্থ দূরবর্তী স্থান। সুতরাং মসজিদুল আকসা অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। মসজিদে হারামের তুলনায় দূরতম 'ইবাদতের স্থান হওয়ায় ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) এটিকে মসজিদুল আকসা নামকরণ করেন। অনেক বছর ধরে মসজিদুল আকসা বলতে পুরো এলাকাকে বুঝানো হতো এবং মসজিদকে আল-জামি আল-আকসা বলা হতো।

ইসলাম পরবর্তী যুগে মসজিদুল আকসার সংস্কার : মসজিদুল আকসার বর্তমান স্থাপনাটি উমাইয়া যুগের। খিলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব প্রথম এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। বেশ কিছু মুসলিম পণ্ডিত যেমন মুজিরউদ্দিন আল-উলাইমি, জালালউদ্দিন সুয়ুতি ও শামসউদ্দিন আল-মুকাদ্দাসি বলেন : খলিফা আবদুল মালিক ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। সেইসাথে তিনি কুব্বাত আস সাখরা নির্মাণ করেন। আব্দুল মালিক মসজিদের কেন্দ্রীয় কক্ষ প্রায় ৪০ মিটার পশ্চিমে সরিয়ে আনেন। পুরনো কক্ষ একটি মিহরাব দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা উমরের মিহরাব বলে পরিচিত। কুব্বাত আস সাখরার উপর গুরুত্ব দিয়ে আবদুল মালিক তার স্থপতিদের দ্বারা নতুন মসজিদকে সাখরার সাথে এক সারিতে আনেন। অন্যদিকে ক্রিসওয়েলের মতে, আব্দুল মালিকের ছেলে প্রথম আল ওয়ালিদ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। অধিকাংশ পণ্ডিত একমত যে, মসজিদের পুনর্নির্মাণ আব্দুল মালিকের সময় শুরু হয় এবং আল ওয়ালিদের সময় তা শেষ হয়। ৭১৩-১৪ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকটি ভূমিকম্পে জেরুসালেমের ক্ষতি হয় এবং মসজিদের পূর্ব অংশ ধ্বংস হয়। এ কারণে আল-ওয়ালিদের শাসনামলে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে।

৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদুল আকসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর চার বছর পর আস-সাফফাহ উমাইয়াদের উৎখাত করে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় আব্বাসী খলিফা আল মনসুর ৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য তার সংকল্প ব্যক্ত করেন এবং ৭৭১

★ *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*

[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৬।*

খ্রিষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। ৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় একটি ভূমিকম্পের ফলে আল মনসুরের সংস্কারের সময়ের দক্ষিণ অংশ বাদে অনেক অংশ ধ্বংস হয়। ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে তার উত্তরসুরি খলিফা আল-মাহদি এর পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি দৈর্ঘ্য কমিয়ে প্রস্থ বৃদ্ধি করেন।

১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরেকটি ভূমিকম্পের ফলে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফাতেমী খলিফা আলি আজ-জাহির ১০৩৪ থেকে ১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করেন। আজ-জাহির কেন্দ্রীয় কক্ষের চারটি তোরণ এবং করিডোর নির্মাণ করেন যা বর্তমানে মসজিদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডাররা জেরুসালেম দখল করে নেয়। এরপর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নেতৃত্বে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমরা জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করার পর মসজিদুল আকসায় কয়েকটি সংস্কার সাধিত হয়। মসজিদের ভেতর ক্রুসেডারদের স্থাপন করা টয়লেট ও শস্যের গুদাম সরিয়ে ফেলা হয়। মেঝে দামি কার্পেটে আচ্ছাদিত করা হয় এবং ভেতরের অংশ গোলাপজল এবং সুগন্ধি দিয়ে সুগন্ধযুক্ত করা হয়। সুলতান নুরউদ্দিন জেনগি ১১৬৮-৬৯ খ্রিষ্টাব্দে হাতির দাঁত ও কাঠ দিয়ে একটি মিম্বর নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন যা তার মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়। নুরউদ্দিনের মিম্বরটি সালাহউদ্দিন মসজিদে স্থাপন করেন।

মসজিদুল আকসার বর্তমান অবকাঠামো : আয়তাকার আল-আকসা মসজিদ ও এর পরিপার্শ্ব মিলিয়ে ১,৪৪,০০০ বর্গমিটার। তবে শুধু মসজিদের আকার প্রায় ৩৫,০০০ বর্গমিটার এবং ৫,০০০ মুসল্লি ধারণ করতে পারে। মসজিদের দৈর্ঘ্য ৮৩ মিটার এবং প্রস্থ ৫৬ মিটার। সম্মুখবর্তী কুব্বাত আস সাখরায় বাইজেন্টাইন স্থাপত্য দেখা গেলেও মসজিদুল আকসায় প্রথম দিককার ইসলামী স্থাপত্য দেখা যায়।

খলিফা আব্দুল মালিকের নির্মিত গম্বুজ বর্তমানে নেই। বর্তমান গম্বুজটি আজ-জাহির নির্মাণ করেছিলেন এবং এটি সীসা আচ্ছাদিত কাঠ দ্বারা নির্মিত।

মসজিদের দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম পাশে মোট চারটি মিনার রয়েছে। প্রথম মিনারটি আল-ফাখারিয়া মিনার নামে পরিচিত যা ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণপশ্চিম অংশে নির্মিত হয়। মামলুক সুলতান লাজিন এটি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি গাওয়ানিমা মিনার বলে পরিচিত। এটি ১২৯৭-৯৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থপতি কাজি শরফউদ্দিন আল-খলিলি কর্তৃক নির্মিত হয়। এটিও সুলতান লাজিনের আদেশে নির্মিত হয়েছিল। ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার মামলুক গভর্নর তানকিজ তৃতীয় মিনার নির্মাণের আদেশ দেন যা বাব আল-সিলসিলা নামে পরিচিত। এটি মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত। সর্বশেষ মিনারটি ১৩৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এটি মিনারাত আল-আসবাত নামে পরিচিত।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ৪৫টি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৩টি সাদা মার্বেল এবং ১২টি পাথরের তৈরি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় মসজিদুল আকসা : ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদুল আকসার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসরা ও মিরাজের রাতে রাসূল (ﷺ) মক্কা থেকে প্রথমে মসজিদুল আকসায় আসেন। এটাকে বলা হয় ইসরা। মসজিদুল আকসায় তিনি উপস্থিত অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করেন। এরপর মসজিদুল আকসা থেকেই শুরু তার ঊর্দ্ধগমণ বা মিরাজ। এখান থেকেই তিনি মহান রবের আমন্ত্রণে তার সাক্ষাতের জন্য রওনা হন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন–

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৫৯]

মর্যাদাগত দিক থেকে মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীর পরেই মসজিদুল আকসার অবস্থান।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন– 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল এবং মসজিদুল আকসা।'[৬০]

মসজিদুল আকসা মুসলিমদের প্রথম কিবলা। পবিত্র কাবা ঘরকে প্রথম কিবলা ঘোষণার আগ পর্যন্ত রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীগণ মসজিদুল আকসার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন। হিজরতের দ্বিতীয় বছর রজব মাসের মাঝামাঝি কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে।

মসজিদুল আকসা কেবল একটি মসজিদ নয়। মসজিদুল আকসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ইতিহাস। জড়িয়ে আছে দেড় হাজার বছরের ইসলামের স্বাতন্ত্র্য। মসজিদুল আকসা আমাদের, মসজিদুল আকসা মুসলিমদের।

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া, সময়টিভি, সামহোয়্যারইনব্লগ ও আর রাহীকুল মাখতূম।

---

[৫৯] *সূরা ইস্‌রা : ১।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৮৯।*

রামাযানুল মুবারক

১৪৪৪ হিজরী ২০২৩ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাযানুল মুবারক। 'আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা'র** শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি**-র ভবনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী- ইনশা-আল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্জ এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০**২৮৫**৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	**বিকাশ পার্সোনাল:** ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

আরযগুযার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ☎ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
✉ jamiyat1946.bd@gmail.com 🌐 www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৩ ইং অনুযায়ী সালাতের সময়সূচি

মে

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৩:৫৯	০৫:২৪	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৫৮
০২	০৩:৫৮	০৫:২৩	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৫৮
০৩	০৩:৫৮	০৫:২৩	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৫৯
০৪	০৩:৫৭	০৫:২২	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৫৯
০৫	০৩:৫৬	০৫:২১	১১:৫৬	০৩:২০	০৬:২৯	০৭:৫৯
০৬	০৩:৫৫	০৫:২১	১১:৫৬	০৩:২০	০৬:৩০	০৮:০০
০৭	০৩:৫৪	০৫:২০	১১:৫৬	০৩:২০	০৬:৩০	০৮:০০
০৮	০৩:৫৩	০৫:২০	১১:৫৬	০৩:২০	০৬:৩১	০৮:০১
০৯	০৩:৫২	০৫:১৯	১১:৫৬	০৩:১৯	০৬:৩১	০৮:০১
১০	০৩:৫২	০৫:১৮	১১:৫৬	০৩:১৯	০৬:৩২	০৮:০২
১১	০৩:৫১	০৫:১৮	১১:৫৬	০৩:১৯	০৬:৩২	০৮:০২
১২	০৩:৫০	০৫:১৭	১১:৫৬	০৩:১৯	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৩	০৩:৪৯	০৫:১৭	১১:৫৬	০৩:১৮	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৪	০৩:৪৯	০৫:১৬	১১:৫৬	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৮:০৪
১৫	০৩:৪৮	০৫:১৬	১১:৫৬	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৮:০৪
১৬	০৩:৪৭	০৫:১৫	১১:৫৬	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৮:০৫
১৭	০৩:৪৭	০৫:১৫	১১:৫৬	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৮:০৫
১৮	০৩:৪৬	০৫:১৫	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০৬
১৯	০৩:৪৫	০৫:১৪	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০৬
২০	০৩:৪৫	০৫:১৪	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০৭
২১	০৩:৪৪	০৫:১৩	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০৭
২২	০৩:৪৪	০৫:১৩	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০৮
২৩	০৩:৪৩	০৫:১৩	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০৮
২৪	০৩:৪৩	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৯
২৫	০৩:৪২	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৯
২৬	০৩:৪২	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:১০
২৭	০৩:৪১	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:১০
২৮	০৩:৪১	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:১১
২৯	০৩:৪১	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:১১
৩০	০৩:৪০	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:১১
৩১	০৩:৪০	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:১২